لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

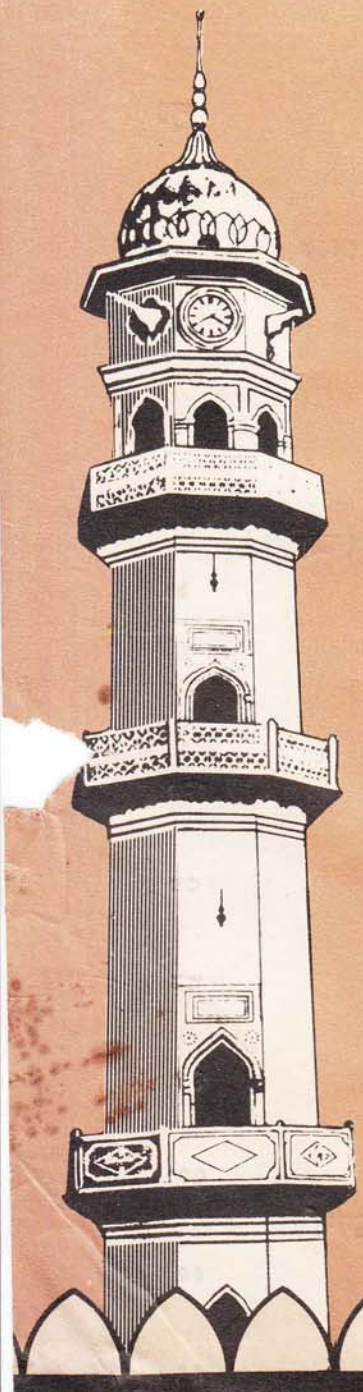

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

৩রা রবিউস সানী, ১৪১৩ হিঃ ।। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৯৯ বাংলা ।। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৫

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৬

জুমু'আর খুতবা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ১১

শুনাতেই সওয়াব
মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ২৮

'মোহাম্মদ' একটি ভবিষ্যদ্বাণী
জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৩০

সমস্যার সাহারা সমাধানের বয়ানী
জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান ৩৩

নারীর মর্যাদা—সেকাল ও একাল
মিসেস রওশন আরা হক ৩৬

ইসলামে সহনশীলতা
জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী ৪৫

ছোটদের পাতা
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৫০

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ
মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী ৫৫

একটি তাজা নিদর্শন
জনাব আলহাজ্জ আহমদ সেনবর্সী ৫৭

সংবাদ ৫৮

সম্পাদকীয় ৬৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ইং : ১৫ই তাবুক, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ৩১শে ভাদ্র, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ আহযাব—৩৩

৪১। মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর; (২৩৫৯) এবং আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী। ৫ম রুকূ

২৩৫৯। 'খাতাম' শব্দটি 'খাতামা' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'খাতাম' অর্থ হইল : সে মোহর মারিল, সে মোহর অঙ্কিত করিল, বস্তুটির ছবি বা ছাপ মারিল। এইগুলি হইল 'খাতামা' শব্দের প্রাথমিক অর্থ। ইহার গৌণ অর্থ হয় : সে বিষয় বা বস্তুটির শেষ প্রান্তে পৌঁছিল, বস্তুটি ঢাকিয়া দিল, লিখিত বস্তুকে সংরক্ষণের জন্য লিখনের উপরে কাদা বা আঁঠা লেপিয়া দিল বা মোহর মারিয়া রাখিল। 'খাতাম' মানে মোহর মারার আংটি, মোহর; অফিস সীল বা ষ্ট্যাম্প; চিহ্ন দিবার যন্ত্র; শেষ প্রান্ত; কোন বস্তুর অন্তিম ফল। 'খাতাম' শব্দ দ্বারা অলংকার; সাজ-সজ্জা; সর্বতোভাবে পূর্ণ বুঝায়। খাতেম, খতম এবং খাতাম প্রায় সমার্থক (লেইন, মুফরাদাত, ফাতহ এবং যুরকানী)। অতএব, 'খাতামান্‌ নাবীঈন'-এর অর্থ হইবে : নবীগণের মোহর, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ নবী, নবীগণের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার। গৌণ অর্থে নবীগণের শেষ অর্থাৎ নবুওয়াতের ও শরীয়াতের কামালিয়ত ও পূর্ণতার দিক দিয়া সর্বশেষ নবী। তবে আরবী ব্যাকরণে 'খাতাম' শব্দটি যাহা 'ইসমে আলা'র (যন্ত্রবোধক বিশেষ্য) পদে ব্যবহৃত, যখন বহু বচনের দিকে 'মুযাআফ' হয়, তখন ইহা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত আলী (রাঃ)-কে নবী করীম (সাঃ) 'খাতামুন্‌ আওলিয়া' (তফসীর সাফী, আয়াত খাতামান্‌ নাবীঈন প্রসঙ্গে) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে 'খাতামুল মুহাজেরীন' বলিয়াছেন (কানযুল

(টীকা অপর পৃঃ দ্রঃ)

৪২। হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।
৪৩। আর সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার তসবীহ্‌ (পবিত্রতা ঘোষণা) কর।

উম্মাল, ৬ পৃঃ)। মক্কায় থাকা অবস্থায় যখন মহানবী (সাঃ)-এর সকল পুত্রই শৈশবে মারা গেলেন তখন শত্রুরা তাঁকে 'আবতার' (অপুত্রক বা আটকুড়া) বলিয়া বিদ্রূপ করিত এবং মনে করিত যে, তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুরুষ না থাকার কারণে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম শীঘ্রই হউক আর দেরীতেই হউক, নিঃশেষ হইয়া যাইবে (মুহীত)। শত্রুদের এই বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরে 'সূরা কাওসারে' অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষণা করা হইল যে, নবী করীম (সাঃ) অপুত্রক নহেন বরং তাঁহার শত্রুরাই অপুত্রক হইয়া যাইবে। সূরা কাওসার অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক মুসলমানদের মধ্যে ধারণা জন্মায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর এমন পুত্র সন্তান জন্ম নিবে যাহারা দীর্ঘজীবী হইবে। আলোচ্য আয়াত এই ধারণাকে নাকচ করিয়া ঘোষণা করিল যে, মহানবী (সাঃ) কখনও যুবক-পুত্রের ('রিজাল' অর্থ পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ) পিতা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও হইবেন না। দেখিতে যদিও মনে হয় যে, এই আয়াত ও সূরা কাওসারের বক্তব্যের মধ্যে বিপরীত কথা রহিয়াছে, তথাপি এই আয়াতটি আসলে ঐ অনুমিত বৈপরীত্যের কারণে সৃষ্ট সংশয়কে দূরীভূত করিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) হইলেন 'রসূলুল্লাহ' (আল্লাহর রসূল), যদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, তিনি সারা উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। শুধু তাহাই নহেন, তিনি খাতামুন্না বীঈনও বটেন অর্থাৎ তিনি সকল নবীগণেরও আধ্যাত্মিক পিতা। অতএব, তিনি যখন সকল মো'মেন ও সকল নবীর আধ্যাত্মিক পিতা, তখন তাঁহাকে কিভাবে 'আবতার' বলা যায়। 'খাতামুন্নাবীঈন এর অর্থ যদি শেষ নবী করা হয়, যাহার পরে আর কখনও কোন নবী আসিবে না, তাহা হইলে প্রসঙ্গের সহিত ইহার কোন সঙ্গতি থাকে না এবং খাপছাড়া হইয়া পড়ে। কেননা অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ ইহাই ছিল যে, মহানবী (সাঃ) একজন 'আবতার' বা অপুত্রক লোক। খাতামুন্নাবীঈনের অর্থ উপরোক্ত ভাবে করিলে, তাহা এই বিদ্রূপের খণ্ডন না হইয়া, বরং এই বিদ্রূপের শক্তিশালী স্বীকৃতি হইয়া দাঁড়ায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 'খাতামের' উপরোল্লিখিত অর্থগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ''খাতামান্নাবীঈন''-এর চারটি সম্ভাব্য অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যথা: (১) হযরত নবী করীম (সাঃ) নবীগণের মোহর অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)-এর সত্যায়নের মোহর ব্যতীত কোন নবীর সত্যতা সাব্যস্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক অতীত নবীর নবুওয়ত মহানবী (সাঃ)-এর সত্যায়ন ও সাক্ষ্য দ্বারা সত্য সাব্যস্ত হয় এবং মহানবী (সাঃ)-এর পরে তাঁহার সত্যিকার অনুসারী ছাড়া কেহ নবুওয়ত লাভ করিতে পারে না। (২) নবী করীম

(টীকা অপর পৃঃ দ্রঃ)

৪৪। তিনিই তোমাদের উপর রহমত পাঠান এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও তোমাদের জন্য রহমত কামনা করে, (২৩৫৯-ক) যাহাতে তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার রাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া আসেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মোমেনদের উপর পরম দয়াময়।

৪৫। যেদিন তাহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে সেদিন তাহাদের সম্ভাষণ ও দোয়া হইবে 'সালাম'। আর তিনি তাহাদের জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদানের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

৪৬। হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা এবং সতর্ক-কারীরূপে,

৪৭। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁহার দিকে আহ্বানকারী আর দীপ্তিমান প্রদীপ রূপে। (২৩৬০)

৪৮। সুতরাং তুমি মো'মেনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে রহিয়াছে মহাঅনুগ্রহ।

৪৯। তুমি কাফেরদের ও মোনাফেকদের কথা মানিও না এবং তাহাদের মর্মপীড়াদায়ক কথাকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। প্রকৃতপক্ষে কার্যনির্বাহকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

(সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মহীয়ান ও পূর্ণতম নবী, যিনি সকল নবীর গৌরব, অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন (যুরকানী, শারাহ মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া)। (৩) মহানবী (সাঃ) ছিলেন শরীয়তবাহী নবীগণের শেষ। এই অর্থ করিয়াছেন মুসলমান উম্মতের প্রখ্যাত বুযুর্গান ওলামা এবং পণ্ডিতগণ, যথা ইবনে আরাবী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইমাম আলী কারী, মুজাদ্দেদ আলফে সানী এবং আরও অনেকে। এই ইসলাম বিশারদ, মহাজ্ঞানী বুযুর্গানে দীন ও ওলী আল্লাহ্‌গণের মতে, নবী করীম (সাঃ)-এর পরে এমন কোন নবী আসিবেন না যিনি তাঁহার মিল্লাত বা শরীয়তকে উঠাইয়া দিবেন অথবা তাঁহার উম্মত হইতে বাহির হইবেন (ফতুহাত, তাফহিমাত, মকতুবাত এবং ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির)। মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিভাময়ী পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা তাঁহাকে (সাঃ) 'খাতামান্ নাবীঈন' বল, কিন্তু এই কথা বলিও না যে, তাঁহার পরে কোন নবী নাই" (মনসুর) (৪) মহানবী (সাঃ) এই অর্থেই শেষ নবী ছিলেন যে, নবুওয়তের গুণাবলী ও সৌন্দর্য সার্বিকভাবে তাঁহার মধ্যে পূর্ণতা পাইয়াছিল এবং একমাত্র তাঁহারই মাধ্যমে পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। আরবীতে সাধারণ ব্যবহারেও, 'খাতাম' শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের শেষ

(টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

সীমা বুঝায়। এতদ্ব্যতীত, কুরআন স্পষ্টভাবে বলিয়াছে, নবী করীম (সাঃ)-এর পরেও উম্মতি নবী আসিবেন (৪:৭০, ৭:৩৬)। মহানবী (সাঃ) নিজের মনেও পরবর্তী কালে নবীর আগমন হইবে বলিয়া স্পষ্ট ধারণা রাখিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইব্‌রাহীম (মহানবী সাঃ-এর পুত্র) যদি জীবিত থাকিত তবে নিশ্চয় সত্য নবী হইত (মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয)। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, এই উম্মতে পরে আবুবকর সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ যদি কোন নবী হন তিনি ব্যতিরেকে (কনযুল উম্মাল)।

২৩৫৯-ক। 'ইউসাল্লি' মানে রহমত ও আশীর্বাদ বর্ষণ ও প্রার্থনা করা উভয় অর্থই হয়।

২৩৬০। সৌর জগতের কেন্দ্রবিন্দু যেমন সূর্য আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য তেমনি মহানবী (সাঃ)। নবীগণ ও ঐশী সংস্কারকগণের জন্য আকাশমণ্ডলের সূর্য তিনিই। নবী ও সংস্কারকগণ মহানবী (সাঃ)-কে ঘিরিয়া তাঁহারই চারিদিকে আবর্তিত হন এবং তাঁহারই কাছ হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া থাকেন। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার সাহাবীগণ প্রত্যেকেই এক একজন নক্ষত্র। তাদের যে কোন একজনকে অনুসরণ করিলে তোমরা সঠিক পথ পাইবে (সগীর)।

(৫ম: পাতার পর)

রসূল করীম (সাঃ)-এর শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। সে জন্যে প্রয়োজন নিজের জীবনে হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ভালোবাসা সৃষ্টি করা। হযরত রসূল করীম (সাঃ) স্বয়ং বলেছেন, আমাকে তোমাদের অনুসরণ করার অর্থ হলো, মুমেন হওয়া এবং তোমরা মুমেন ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি হতে প্রিয় হই। খোদার ভালবাসা পেতে হলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ভালোবাসতে হবে। তাহলেই খোদাকে পাওয়া যাবে।

হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা আধ্যাত্মিক জগতের সীরাজুম্‌ মুনীর তথা দীপ্তিমান সূর্য বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আজ আমরা সেই সূর্য হতে বহু দূরে সরে আছি বিধায় আমাদের এই দুরবস্থা। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে গেছি। খোদার আশীষ ও রহমত পেতে হলে তাই আজ আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভালবাসায় বিলীন হয়ে তাঁর শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে প্রিয় ও মহান নবীকে ভালোবেসে তাঁর জীবনাদর্শ নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করার তৌফীক দান করুন

হাদিস শরীফ

রাসূলের ভালোবাসা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

قل ان كنتم تحبون الله فا تبعونى يحببكم الله ويغفر لكم
ذنوبكم والله غفور رحيم ٥

অর্থাৎ তুমি বলে দাও যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

(আলে্ ইমরান : ৩২)

হাদীস ঃ

عن انس رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه و سلم لا يؤمن
احدكم حتى اكون احب اليه من والده والناس اجمعين (بخارى)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমেন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ হতে প্রিয় হই।

(বুখারী)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এই বিশ্বের জন্য সর্বকালের নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর দ্বারা আল্লাহ্তা'লা সর্বকালের জন্য শরীয়ত কুরআন রূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁর দ্বারাই খোদাতা'লা সমগ্র বিশ্বের জন্য ইসলামকে তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আজ আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যতিরেকে আর কোন পথ নেই। খোদা প্রাপ্তির জন্য হযরত খাতামুন্নাবীঈন (সাঃ)-ই এক মাত্র মাধ্যম। তিনি যে পথ আমাদিগকে দেখিয়ে গেছেন আজ আমাদিগকে সেই পথের পথিক হতে হবে। সেই পথের পথিক হতে হলে আমাদেরকে হযরত

(অবশিষ্টাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এখন খৃষ্টান জাতি দ্বিগুণ দুর্ভাগ্যে নিপতিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে তাহারা খোদাতা'লার তরফ হইতে সাহায্য লাভ করিতে পারে না। কেননা ইলহামের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পুণ্য কর্মের দিক হইতে তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। কেননা প্রায়শ্চিত্ত তাহাদিগকে সাধ্য-সাধনা ও প্রচেষ্টা হইতে বিরত করিয়াছে। কিন্তু যে পরিপূর্ণ মানবের উপর কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হইয়াছে তাঁহার দৃষ্টি সীমিত ছিল না এবং মানব জাতির জন্য তাঁহার চিন্তা ও সহানুভূতিতে কোন ঘাটতি ছিল না। বরং যুগের দিক হইতেই হউক বা স্থানের দিক হইতেই হউক তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল। এই জন্য খোদার জ্যোতিঃ বিকাশের পরিপূর্ণ অংশ তিনি লাভ করিয়াছেন এবং তিনি খাতামুল আম্বিয়া হইয়াছেন। কিন্তু ইহা এই অর্থে নহে যে, ভবিষ্যতে কেহ তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক আশীষ লাভ করিবে না ; বরং এই অর্থে যে, তিনি খাতামের অধিকারী। তাঁহার মোহর ব্যতীত কাহারো নিকট কোন আশীষ পৌঁছিতে পারে না এবং তাঁহার উম্মতের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাক্যালাপ ও সম্বোধনের দরজা কখনো বন্ধ হইবে না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন নবী খাতামের অধিকারী নহেন। তিনিই একমাত্র নবী, যাঁহার মোহর দ্বারা এইরূপ নবুওয়াত লাভ করা যাইতে পারে যাহার জন্য উম্মত হওয়া অত্যাবশ্যক। তাঁহার ক্ষমতা ও সহানুভূতি উম্মতকে শোচনীয় অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই।* তাহাদের উপর ওহীর দরজা, যাহা তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রকৃত শিকড়, তাহা বন্ধ থাকা আল্লাহ পসন্দ করেন নাই। হাঁ, তাঁহার খতমে রেসালতের চিহ্ন

---

* টীকা : এ স্থলে এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠিতে পারে যে, হযরত মূসা (আঃ) এর উম্মতে অনেক নবী অতিবাহিত হইয়াছেন। অতএব এমতাবস্থায় মূসার শ্রেষ্ঠ হওয়া জরুরী হইয়া পড়ে। ইহার উত্তর এই যে, যত নবী অতিবাহিত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলকে খোদা সরাসরি মনোনীত করিয়াছিলেন। ইহাতে হযরত মূসার কোনই হাত ছিল না। কিন্তু এই উম্মতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার প্রসাদে হাজার হাজার আউলিয়া হইয়াছেন এবং একজন তিনিও হইয়াছেন, যিনি উম্মতী এবং নবীও। এত কল্যাণের আধিক্য অন্য কোন নবীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইসরাঈলী নবীগণ ব্যতীত মূসায়ী উম্মতের অধিকাংশ লোকের মধ্যে দোষত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। নবীগণের কথায় আসা যাক। আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, তাঁহারা হযরত মূসা হইতে কিছুই পান নাই, বরং তাঁহাদিগকে সরাসরি নবী করা হইয়াছিল। কিন্তু মুহাম্মদী (সাঃ) উম্মতের হাজার হাজার ব্যক্তিকে কেবল অনুবর্তিতার জন্য ওলী করা হইয়াছে।

কায়েম রাখার জন্য ইহা চাহিলেন যে, ওহীর আশীষ তাঁহার অনুবর্তিতার মাধ্যমে লাভ হউক এবং যে ব্যক্তি উম্মত হইবে না তাহার জন্য ওহী ইলহামের দরজা বন্ধ হউক। অতএব খোদা এই অর্থে তাঁহাকে খাতামুল আম্বিয়া সাব্যস্ত করেন। এই জন্য কেয়ামত পর্যন্ত ইহা নির্ধারিত হইল যে, যে ব্যক্তি সত্যিকারের অনুবর্তিতার দ্বারা নিজেকে উম্মত হওয়া প্রমাণ না করিবে এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতায় নিজের সকল অস্তিত্বকে নিয়োজিত না করিবে, সে কেয়ামত পর্যন্ত না কোন পরিপূর্ণ ওহী লাভ করিতে পারে, না পরিপূর্ণ ওহী প্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে পারে। কেননা স্বাধীন নবুওয়াত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'যিল্লী' নবুওয়ত (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর প্রতিচ্ছায়া রূপে নবুওয়াত—অনুবাদক), যাহার অর্থ কেবলমাত্র মুহাম্মদী (সাঃ) কল্যাণে ওহী পাওয়া, তাহা কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যাহাতে মানুষের পরিপূর্ণতার দরজা বন্ধ না হয় এবং পৃথিবী হইতে এই চিহ্ন মুছিয়া না যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ক্ষমতা কেয়ামত পর্যন্ত ইহাই চাহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌র সহিত বাক্যালাপ ও সম্বোধনের দরজা খোলা থাকিবে এবং আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান, যাহা পরিত্রাণের জননী, তাহা হারাইয়া না যায়।

কোন সহীহ হাদীস হইতে এই কথা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর কোন এইরূপ নবী আগমন করিবেন, যিনি উম্মত হইবেন না, অর্থাৎ তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তিতা দ্বারা কল্যাণপ্রাপ্ত নহে। এইখানে ঐ সকল লোকের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়, যাহারা অযথা হযরত ঈসা (আঃ)-কে দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে আনিতে চাহে। ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয়বার আগমনের তাৎপর্য, যাহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে * তাহা হইতেও এই সকল লোক কোন শিক্ষা গ্রহণ করে

---

* টীকা: হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের বিষয়টি খৃষ্টানেরা শুধু নিজেদের সুবিধার জন্য বানাইয়া লইয়াছিল। কেননা তাঁহার প্রথম আগমনে তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরত্বের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। তিনি সব সময় মার খাইতে ছিলেন এবং দুর্বলতা দেখাইতে ছিলেন। সুতরাং তাহারা এই ধারণা পেশ করিল যে, দ্বিতীয় আগমনে তিনি ঈশ্বরত্বের প্রতাপ দেখাইবেন এবং প্রথম বারের প্রতিশোধ লইবেন যাহাতে এইভাবে প্রথম আগমনের অবস্থা পর্দাবৃত করা যায়। কিন্তু এখন ঐ যুগ আসিয়া পড়িয়াছে যে, খৃষ্টানেরা নিজেরাই এইরূপ বিশ্বাস হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতেছে। আমি বিশ্বাস করি যে, যখন তাহাদের বুদ্ধি-বিবেচনার উন্নতি হইবে তখন তাহারা অতি সহজে এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে এবং যেরূপে শিশু পরিণত অবস্থায় মাতৃগর্ভে থাকিতে পারে না, তদ্রূপে তাহারাও অন্ধকার পর্দা ও অজ্ঞতা হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

না। বরং যে সকল হাদীস হইতে আগমনকারী মসীহের সংবাদ পাওয়া যায় ঐ সকল হাদীসে তাঁহার এই চিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি নবীও হইবেন এবং উম্মতীও হইবেন। কিন্তু মরিয়মের পুত্র কি উম্মতী হইতে পারেন? কিভাবে প্রমাণ করিবে যে, তিনি সরাসরি নহেন, বরং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার দ্বারা নবুওয়তের মর্যাদা লাভ করিয়া ছিলেন?

هذا هو الحق ط وان تولوا فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين -

(অর্থাৎ ইহাই সত্য, যদি তোমরা পিঠ ফিরাইয়া না নাও। তুমি বল, আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কান্নাকাটি করিয়া দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লানত যাচ্ঞা করি—অনুবাদক)। হাজার বার চেষ্টা ও ব্যাখ্যা করিলেও এই কথা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর এইরূপ কোন নবী আগমন করিবেন, যখন লোকেরা নামাযের জন্য মসজিদের দিকে দৌড়াইবে তখন তিনি গীর্জার দিকে ছুটিবেন, যখন লোকেরা কুরআন শরীফ পড়িবে তখন তিনি বাইবেল খুলিয়া বসিবেন, যখন লোকেরা উপাসনার সময় বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করিবে তখন তিনি বায়তুল মোকাদ্দসের দিকে রুজু করিবেন এবং মদ্যপান করিবেন, শূকরের মাংস খাইবেন এবং ইসলামের হালাল ও হারামের কোন পরওয়া করিবেন না। কোন বিবেক কি এই কথা মানিয়া নিতে পারে যে, ইসলামের জন্য এই বিপদের দিনও বাকী আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর এইরূপ কোন নবীও আগমন করিবে, যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবুওয়তের দ্বারা তাঁহার (সাঃ) খতমে নবুওয়তের মোহরকে ভাংগিয়া দিবে, তাঁহার (সাঃ) খাতামুল আম্বিয়া হওয়ার কল্যাণ ছিনাইয়া নিবে, তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তিতার দ্বারা নহে, বরং সে সরাসরি নবুওয়তের মর্যাদা লাভ করিবে, তাহার কার্যক্রম মুহাম্মদী (সাঃ) শরীয়তের বিরোধী হইবে, সে কুরআন শরীফের ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া লোকদিগকে বিভেদের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং ইসলামের অবমাননার কারণ হইবে। নিশ্চিত জানিবে যে, খোদা কখনো এইরূপ করিতে পারেন না।* নিঃসন্দেহে

---

* টীকা: এই কথা বলা যে—হযরত ঈসার দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন একটি সর্ববাদী সম্মত বিশ্বাস—ইহা সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা রটনা। সাহাবাগণের (রাঃ) সর্ববাদী সম্মত ঐকামত এই আয়াতের উপর হইয়াছিল যে, ما محمد الا رسول ج قد خلت من قبله الرسل ط (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) (অর্থ:—মুহাম্মদ কেবল একজন রসুল। তাঁহার পূর্বেকার সকল রসুল অবশ্যই গত হইয়াছে—অনুবাদক:)। তাঁহাদের পর উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ফেরকা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মোতাবেলা সম্প্রদায় আজো হযরত ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী এবং কোন কোন শ্রেষ্ঠ সুফীও তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্বাসী। প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে যদি উম্মতের মধ্যে কেহ এই ধারণাও পোষণ করে যে, হযরত ঈসা দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন, তবে তাহাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না। ইহা কেবল তাহাদের বুঝার ভুল। কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী বুঝার ক্ষেত্রে ইসরাঈলী নবীগণও এইরূপ ভুল করিয়াছেন।

হাদীসসমূহে প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে 'নবী' খেতাব মজুদ আছে। কিন্তু ইহার সাথে 'উম্মতী' খেতাবও তো মজুদ আছে এবং যদি মজুদ নাও থাকিত তবেও উপরোল্লিখিত বিভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বীকার করিতে হয় যে, কখনো এইরূপ হইতে পারে না যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী আগমন করিবে। কেননা এইরূপ ব্যক্তির আগমন করা সম্পূর্ণরূপে খতমে নবুয়তের পরিপন্থী। অতঃপর তাহাকে উম্মত বানানো হইবে এবং ঐ নও মুসলিম নবীকেই প্রতিশ্রুত মসীহ আখ্যায়িত করা হইবে— এই ব্যাখ্যার সহিত ইসলামের মর্যাদার দূরবর্তী সম্পর্কও নাই। হাদীসসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের মধ্যে ইহুদী সৃষ্টি হইবে। পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহুদী সৃষ্টি হইবে এই উম্মতে, কিন্তু মসীহের আগমন হইবে বাহির হইতে। একজন খোদা-ভীরুর জন্য ইহা কি একটি মুস্কিলের ব্যাপার যে, যেরূপে তাহার বুদ্ধি বিবেচনা এই কথা মানিয়া নেয় যে, এই উম্মতে কোন কোন লোক এইরূপ সৃষ্টি হইবে যাহাদের নাম ইহুদী রাখা হইবে, তদ্রূপেই এই উম্মতে এক ব্যক্তি সৃষ্টি হইবে যাঁহার নাম ঈসা ও প্রতিশ্রুতি মসীহ রাখা হইবে। হযরত ঈসাকে আকাশ হইতে নামানোর এবং তাঁহার স্বাধীন নবুওয়তের ভূষণ খুলিয়া তাঁহাকে উম্মতী বানানোর কি প্রয়োজন আছে? যদি বল এই কার্যক্রম শাস্তি স্বরূপ হইবে, কেননা তাঁহার উম্মতেরা তাঁহাকে খোদা বানাইয়া ছিল, তাহা হইলে এই উত্তরও অর্থহীন। কেননা ইহাতে হযরত ঈসার কি অপরাধ ছিল?

আমি এই সকল কথা কোন ধারণা ও অনুমান হইতে বলিতেছি না; বরং খোদাতা'লা হইতে ওহী পাইয়া বলিতেছি। আমি তাঁহার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, তিনিই আমাকে ইহা অবহিত করিয়াছেন। সময় আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। খোদার নিদর্শন আমার সাক্ষ্য দিতেছে।

এতদ্ব্যতীত, যখন কুরআন শরীফ হইতে নিশ্চিতরূপে হযরত ঈসার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তখন তাঁহার দ্বিতীয় আগমনের ধারণা সম্পূর্ণরূপে অবান্তর। কেননা যে ব্যক্তি জীবিত বিদ্যমান নাই তিনি কিভাবে পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করিতে পারেন?

যদি বলুন কুরআন শরীফের কোন্ আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মরিয়া যাওয়া প্রমাণিত হয়, তবে আমি নমুনা স্বরূপ এই আয়াতের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি, যাহা কুরআন শরীফে আছে; অর্থাৎ এই আয়াত فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم (আল্ মায়েদা: ১১৮) (অর্থ:—কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।—অনুবাদক)। এস্থলে যদি توفى এর অর্থ সশরীরে জড়দেহে আকাশে উঠানো করা হয় তবে

এই অর্থ সম্পূর্ণরূপে অবান্তর হইবে। কেননা কুরআন শরীফের এই আয়াত দ্বারাই বুঝা যায় যে, এই প্রশ্ন হযরত ঈসাকে কেয়ামতের দিন করা হইবে। অতএব ইহাতে তো জরুরী হইয়া পড়ে যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই উত্তোলিত দৈহিক অবস্থাতেই খোদাতা'লার সম্মুখে পেশ হইয়া যাইবেন এবং ইহার পর কখনো মৃত্যুবরণ করিবেন না। কেননা কেয়ামতের পর মৃত্যু নাই। এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অবান্তর।

ইহা ছাড়া, যে স্থলে এই বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি কেয়ামতের পূর্বে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন, সে স্থলে "যেদিন হইতে আমাকে সশরীরে জড়দেহে আকাশে উঠানো হইয়াছে সে দিন হইতে আমি জানিনা আমার উম্মতের কি অবস্থা হইয়াছে"— কেয়ামতের দিন তাঁহার এই উত্তর সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসিবে, নিজের উম্মতের অংশীবাদিতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে, বরং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাদের ক্রুশ ধ্বংস করিবে এবং তাহাদের শূকরগুলিকে হত্যা করিবে, সে কিভাবে কেয়ামতের দিন বলিতে পারে যে, আমি নিজের উম্মত সম্পর্কে কিছুই জানি না?

(ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

মালী কুরবানী

ভাবানুবাদ
চৌধুরী আবদুল মতিন

ز بذل مال در راهش کسے مفلس نمی گردد -
خدا خود می شود ناصر اگر همت شود پیدا -
(حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

"যে ব্যক্তি মালে দার্ রাহাশ ক্যাসে মুফ্লেস্ নামে গারদাদ্
খোদা খোদ মিশাওয়াদ্ নাসের আগার হিম্মত শাওয়াদ পয়দা।

খোদার পথে খরচ করে পথের কাঙ্গাল কেউ হবে না—
খোদা স্বয়ং সহায় হবেন।
হিম্মতে প্রাণ জাগাও তবে—
দারিদ্রাগারে রবে না, রবে না।।

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

(মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত ৩-৪-১৯৯২ তারিখে খুতবার বঙ্গানুবাদ]

মাওলানা সালেহ্ আহমদ
সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ ও তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা রহমানের এই আয়াতটির তেলাওয়াত করেন :

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام ٥

অর্থাৎ ইহার (ভূপৃষ্ঠের) উপর যা কিছু আছে সবই নশ্বর, এবং অবিনশ্বর হয়ে থাকবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি।
(সূরা রহমান ২৭-২৮)

হুযুর (আইঃ) বলেন, আমি সূরা রহমানের যে আয়াতগুলির তেলাওয়াত করেছি তার মধ্যে একটি অপরিবর্তনীয়, মহান ও চিরস্থায়ী ঘোষণা রয়েছে। উহাতে একত্ববাদের গভীর রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। খোদাতা'লা এক-অদ্বিতীয়। এক-অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্কের রহস্য এই আয়াতগুলিতে উন্মোচন করা হয়েছে। كل من عليها فان অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু যা এই জগতে আছে লয় প্রাপ্ত হবে অবশিষ্ট থাকবে না। فان ধ্বংস হয়ে যাবে। وجه ربك ذو الجلال والاكرام এই আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ হলো তোমার প্রভুর চেহারা যা প্রতাপ ও সম্মানের চেহারা তা অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। কিন্তু এই আয়াতের অনুবাদে অনুবাদকারীগণ জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন। যদ্দরুন অনুবাদ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করা হয়েছে। "খোদার চেহারা'র অর্থ কি ? কতিপয় অনুবাদকারী ইহার অর্থ খোদাতা'লার সত্তা করে থাকেন। আর (আয়াতের) অনুবাদ করেন খোদার সত্তা অবিনশ্বর হয়ে থাকবে এবং অবশিষ্ট সকল বস্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিছু সংখ্যক (অনুবাদক) এই অনুবাদ করেছেন যে, যার প্রতি খোদার দৃষ্টি পড়ে এবং যে খোদার সুনজরে পড়ে সে এই (নিশ্চিহ্ন) হওয়া থেকে ব্যতিক্রম থাকবে। সে-ই অবিনশ্বর হয়ে থাকবে যে, খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং খোদার সন্তুষ্টিকে ধরে রাখবে।

হযরত ফযলে ওমর (রাঃ)ও এই তত্ত্বপূর্ণ অনুবাদ করেছেন যে, كل من عليها فان অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু নশ্বর, অমৌলিক ও মূল্যহীন। বাহ্যতঃ দৃশ্য বস্তুরও টিকে থাকার কোন মূল্য নেই। ঐ সকল বস্তুই অবিনশ্বর যা প্রভুর সন্তুষ্টির সাথে জীবিত এছাড়াও

ইহাতে আরেকটি তত্ত্ব রয়েছে যে, যদি কোন বস্তু অবশিষ্ট থাকে তবে উহা নিজ সত্তায় বিদ্যমান থাকতে পারে না। একমাত্র শব্দটি ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, আমরা এই পৃথিবীতে খোদা ছাড়াও বহু বস্তু লক্ষ্য করি অপরদিকে আমাদের সাথে সাথে পারলৌকিক জীবনেরও অঙ্গীকার করা হয়েছে তাহলে كل من عليها فان এর অর্থ কি শুধু এই যে, পৃথিবীর সকল বস্তু বিলীন হয়ে এক নতুন জীবন লাভ করবে। কিন্তু এই অর্থ তো প্রযোজ্য নয় বরং ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে যার সম্পর্ক স্থাপন হবে সে-ই নতুন জীবন লাভ করবে ও অবিনশ্বর হয়ে যাবে। কিন্তু যারা খোদার সন্তুষ্টি হতে বঞ্চিত (তারা লয় প্রাপ্ত)। رحم এর অর্থ হলো সুদৃষ্টি, শ্রদ্ধা, করুণা, স্নেহ আদরও ভালোবাসার সকল আঙ্গিক (رحم) স্নেহের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহার অর্থ হলো যাদের প্রতি খোদাতা'লার সুদৃষ্টি রয়েছে তারা নশ্বর অস্তিত্ব নয় তারা সর্বকালের জন্য বিদ্যমান? অতএব এই আয়াতের সম্বোধনকারী অস্তিত্ব হলেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। এই আয়াতটি যথাথভাবে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্য প্রযোজ্য।

আজ ২৯শে রমযান ও জুমুআর পবিত্র দিন। ইহাকে জুমুআতুল বিদাও বলা হয়। এই জুমুআর প্রথম মুহূর্তে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের সূর্য অস্ত গিয়ে যখন শুক্রবারের রাত শুরু হলো ও ইংরেজী (মাসের) তারিখ অনুযায়ী রাত ১২টার কয়েক মিনিট গত হলো সেই সময়ে আমার স্ত্রী তাঁর খোদার (দিকে প্রত্যাবর্তনের) আহ্বান পেল। ইহার পূর্বে আমি তার (স্ত্রীর) সম্বন্ধে কখনও বলি নি। আর ইহার কারণও ছিল। প্রধানতঃ আমি ভয় করছিলাম যে, আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে গোটা জামা'ত যার পূর্বেই আবেগাপ্লুত হয়ে আছে তারা জবাইর (করার ন্যায়) কষ্টে নিপতিত হবে। জামা'তের সাথে আমার সম্পর্ক এমন যে, আমি জামা'তের হৃদয়ে বাস করি। আর জামা'ত আমার হৃদয়ে বাস করে। এই সম্পর্ক চিঠি পত্রের মুখাপেক্ষী নয়। আহ্বানের মুখাপেক্ষী নয়। কাউকে বলতে হয় না যে, সে আমাকে কত ভালোবাসে। আমাকেও কাউকে বলতে হয় না যে, আমি তাকে কত ভালোবাসি। ইহা এমন এক বহমান জীবিত সম্পর্ক যা "তোমার প্রভুর সুদৃষ্টির" কল্যাণে আমি পেয়েছি। "তোমার প্রভুর সুদৃষ্টির" (رحم ربك) নিদর্শন এই যে, খোদার ভালোবাসা এত নিগূঢ় গভীর হয়ে যায় যেন তার মোকাবেলায় জাগতিক ভালোবাসা অতি তুচ্ছ হয়ে পড়ে। আমি এই আশংকায় ছিলাম যে, আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলে ঐ সকল আহমদী যারা আমার কষ্টকে গভীরভাবে উপলব্ধি করছে তাদের (মানসিক) অবস্থার যেন অবনতি না ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ এ কথাও ভাবছিলাম যে, (খুতবায়) আমার বলার কোন প্রয়োজন নেই। তারাও জানে আমিও জানি, খবরা খবর পৌঁছাচ্ছে। এবং সবাই অবস্থা সম্বন্ধেও ওয়াকেবহাল

তৃতীয়তঃ আরও একটি কারণ ছিল তা এই যে, কতিপয় রূইয়ার ভিত্তিতে এমন মনে হচ্ছিল যে, খোদার তকদীর আরোগ্যের দ্বারা প্রকাশিত হবে অপরদিকে অন্য আরও চিহ্নাবলী এমন প্রকাশিত হচ্ছিল যদ্দরুন জামা'তের সামনে কোন কিছু নিশ্চিতরূপে তুলে ধরতে পারছিলাম না। যদি খোদার তরফ হতে পরিষ্কারভাবে মৃত্যুর সংবাদ পেতাম তাহলে আমি জামা'তকে এই পরিস্থিতির জন্যে (মানসিকভাবে) প্রস্তুত করতাম। যদি স্পষ্টভাবে আরোগ্যের সংবাদ পেতাম তবুও জামা'তকে (মানসিকভাবে) প্রস্তুত করতাম। এবং অবগত করাতাম যে, খোদাতা'লা আমাকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন ইহার পূর্বে আপনাদিগকে (কিছু সুসংবাদ) শুনানো হয়েছিল এবং খোদাতা'লা তা অত্যন্ত মর্যাদার সাথে আপনাদের পক্ষে ঐ সকল (রূইয়াকে) পূর্ণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এমন কিছুই ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ আপনাদের সামনে এই সময়কার কিছু ঘটনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরব। যদ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারবেন যে, আমরা কতই না দোটানা ও চিন্তার মধ্যে ছিলাম। সর্ব প্রথম আপনাদিগকে জানাচ্ছি যে, তার (স্ত্রীর) জন্ম ২১শে জানুয়ারী ১৯৩৬ইং হয়েছে। এই দিক হতে তিনি আমার থেকে ৮ বছরের ছোট। আমাদের বিবাহ ১৯৫৭ সনে সালানা জলসার নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। তারিখটি সঠিক স্মরণ নেই, মনে হয় ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে। আমাদের মাঝে কতিপয় (মানসিক) মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও এক দীর্ঘ সময় তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আমার সাথে জীবন কাটিয়েছেন। দৈনন্দিন থাকা খাওয়ার মান এর দরুন মানসিক ও সামাজিক মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমাদের মাতাপিতা শৈশবে আমাদিগকে অত্যন্ত সাধারণভাবে রেখেছেন ও দরিদ্রের অবস্থায় আমাদের জীবন যাপন করতে হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা ঐ সকল থেকে সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলাম যা ধনী পরিবারের সন্তানরা পেয়ে থাকত, যেমন পাহাড়ে (অবকাশ স্থানে) যাওয়া, শিকার করতে যাওয়া যাতে আমরা হীন মন্যতা বোধ না করি। কিন্তু হযরত ফযলে ওমর (রাঃ) ইচ্ছা করে আমাদের কষ্ট সহিষ্ণু বানানোর চেষ্টা করেছেন; সাধারণ জীবন যাপনের শিক্ষা তিনি নিজের ঘরেও বাস্তবায়িত করেছেন। তার (স্ত্রী) পরিবারের জীবন যাপনের মান আমাদের চাইতে উন্নত মানের ছিল। একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর (জীবন উৎসর্গকারী) সাথে বিবাহিত হয়ে আমাদের ঘরে আসলেন, যার দৈনন্দিন জীবন যাপন অত্যন্ত সাধারণ ছিল। যদ্দরুন তার কষ্টে জীবন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে দিন কাটিয়েছেন কখনও কোন দাবী করেন নি। গোটা জীবনে তিনি কখনও আমার উপর এই বোঝা চাপান নি যে, আমার আয়ত্বের বাইরে কোন কিছু এমন দাও, যা মানসিকতার বিরোধ ও ধর্মীয় (তরবীয়তের) অসামঞ্জস্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এবং স্নেহের সাথে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার তরবীয়ত করতে হয়েছে। প্রারম্ভে জামা'তের মহিলা ও জামা'তের সংগঠনের সাথে তাঁর কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে সেই সম্পর্কটি স্থাপন করেছেন। এরপর আমি বিয়ের ইস্তেখারা সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলতে চাই:

তৃতীয়তঃ আরও একটি কারণ ছিল তা এই যে, কতিপয় রুইয়ার ভিত্তিতে এমন মনে হচ্ছিল যে, খোদার তকদীর আরোগ্যের দ্বারা প্রকাশিত হবে অপরদিকে অন্য আরও চিহ্নাবলী এমন প্রকাশিত হচ্ছিল যদ্দরুন জামা'তের সামনে কোন কিছু নিশ্চিতরূপে তুলে ধরতে পারছিলাম না। যদি খোদার তরফ হতে পরিষ্কারভাবে মৃত্যুর সংবাদ পেতাম তাহলে আমি জামা'তকে এই পরিস্থিতির জন্যে (মানসিকভাবে) প্রস্তুত করতাম। যদি স্পষ্টভাবে আরোগ্যের সংবাদ পেতাম তবুও জামা'তকে (মানসিকভাবে) প্রস্তুত করতাম। এবং অবগত করাতাম যে, খোদাতা'লা আমাকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন ইহার পূর্বে আপনাদিগকে (কিছু সুসংবাদ) শুনানো হয়েছিল এবং খোদাতা'লা তা অত্যন্ত মর্যাদার সাথে আপনাদের পক্ষে ঐ সকল (রুইয়াকে) পূর্ণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এমন কিছুই ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ আপনাদের সামনে এই সময়কার কিছু ঘটনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরব। যদ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারবেন যে, আমরা কতই না দোটানা ও চিন্তার মধ্যে ছিলাম। সর্ব প্রথম আপনাদিগকে জানাচ্ছি যে, তার (স্ত্রীর) জন্ম ২১শে জানুয়ারী ১৯০৬ইং হয়েছে। এই দিক হতে তিনি আমার থেকে ৮ বছরের ছোট। আমাদের বিবাহ ১৯৫৭ সনে সালানা জলসার নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। তারিখটি সঠিক স্মরণ নেই, মনে হয় ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে। আমাদের মাঝে কতিপয় (মানসিক) মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও এক দীর্ঘ সময় তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আমার সাথে জীবন কাটিয়েছেন। দৈনন্দিন থাকা খাওয়ার মান এর দরুন মানসিক ও সামাজিক মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমাদের মাতাপিতা শৈশবে আমাদিগকে অত্যন্ত সাধারণভাবে রেখেছেন ও দরিদ্রের অবস্থায় আমাদের জীবন যাপন করতে হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা ঐ সকল থেকে সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলাম যা ধনী পরিবারের সন্তানরা পেয়ে থাকত, যেমন পাহাড়ে (অবকাশ স্থানে) যাওয়া, শিকার করতে যাওয়া যাতে আমরা হীন মন্যতা বোধ না করি। কিন্তু হযরত ফযলে ওমর (রাঃ) ইচ্ছা করে আমাদের কষ্ট সহিষ্ণু বানানোর চেষ্টা করেছেন; সাধারণ জীবন যাপনের শিক্ষা তিনি নিজের ঘরেও বাস্তবায়িত করেছেন। তার (স্ত্রী) পরিবারের জীবন যাপনের মান আমাদের চাইতে উন্নত মানের ছিল। একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর (জীবন উৎসর্গকারী) সাথে বিবাহিত হয়ে আমাদের ঘরে আসলেন, যার দৈনন্দিন জীবন যাপন অত্যন্ত সাধারণ ছিল। যদ্দরুন তার কষ্টে জীবন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে দিন কাটিয়েছেন কখনও কোন দাবী করেন নি। গোটা জীবনে তিনি কখনও আমার উপর এই বোঝা চাপান নি যে, আমার আয়ত্বের বাইরে কোন কিছু এমন দাও, মন মানসিকতার বিরোধ ও ধর্মীয় (তরবীয়তের) অসামঞ্জস্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এবং স্নেহের সাথে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার তরবীয়ত করতে হয়েছে। প্রারম্ভে জামা'তের মহিলা ও জামা'তের সংগঠনের সাথে তাঁর কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে সেই সম্পর্কটি স্থাপন করেছেন। এরপর আমি বিয়ের ইস্তেখারা সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলতে চাই:

ঔষধও দেয়া হচ্ছিল কিন্তু তাতে কিছু নিরাময় হচ্ছিল না। কেননা উহা ক্যানসারের দৃষ্টি-কোণ হতে দেয়া হচ্ছিল না। খোদার ফযলে অনেক সময়ে (ঔষধ দেবার পর) কয়েক মিনিটের মধ্যেই শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তেন।

তার হৃদয়ে একথা গেঁথে গিয়েছিল যে, তার অত্যন্ত জটিল রোগ কিন্তু ডাক্তারগণ তা ধরতে পারছেন না। আমাকে (অনেক সময়) বলতেন, ক্যানসার তো হয়নি? অতঃপর আমি দোয়া করলাম। তখন একটি অদ্ভুত রূইয়া দেখলাম যদ্দরুন আমি স্বস্তি পেলাম কিন্তু পরবর্তী অবস্থা হতে জানতে পারলাম যে, ইহাতে আল্লাহ্‌র বিশেষ শান ছিল। এক বিশেষ রূপে তিনি সান্ত্বনার প্রকাশ করলেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তকদীর বদলানোর কোন প্রশ্নই ছিল না। তকদীর নিজের জায়গায় অটল ছিল রূইয়াতে আমি দেখলাম, তার (স্ত্রীর) মাতা আপা আমাতুস সালাম একটি ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ঘরের নক্‌শাটি লম্বায় এই মসজিদটির (লণ্ডনের মসজিদ) মত। সেই দুই তৃতীয়াংশের সামনে আমি যেই প্রান্ত হতে আসছি সেই প্রান্তের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বা দিকে একটি নর্দমার অপর দিকে একটি রান্নাঘর যেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। খাবার রান্না করা আছে এবং আপা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে আনন্দিত হয়ে তিনি বললেন, সে এসে গিয়েছে এবং আমাকে ঘরের পরি-স্থিতি সম্বন্ধে বলতে লাগলেন যে, সব কটি নর্দমা বন্ধ হয়ে আছে। খাবার প্রস্তুত কিন্তু কেউ এদিকে আসছেও না খাবারও খাচ্ছে না। রান্না ঘরে ঠিক আগের মতই খাবার পড়ে আছে। এর সাথে তিনি আরও বললেন যে, এর আগেও এরূপে নর্দমাগুলি বন্ধ হয়েছিল। যখন সে আসলো সে কোন বস্তু নিক্ষেপ করল এবং উহা আকাশের দিকে উড়ে গেল ও কোন বস্তু নীচে পড়ল আর সকল নর্দমা খুলে গেলো। এখনও অনুরূপ হবে এবং সকল নর্দমা খুলে যাবে। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর আমি ইহার তা'বির বুঝলাম যে, এরপূর্বে যখন হার্ট এটাক হয়েছিল তখন পাকস্থলী কোন কিছুই গ্রহণ করছিল না সব কিছু বমি হয়ে যেত এবং আমরা এর কারণ বুঝতে পারছিলাম না। ডাক্তারগণ প্রত্যেক ধরণের ঔষধ দিলেন কিন্তু কোন লাভ হলো না। যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হলো তখন জানা গেল যে, হৃদপিণ্ডের শিরাগুলি বন্ধ হয়ে আছে এবং এই শিরাগুলি বন্ধ হবার কারণেই এই সকল কষ্ট। সুতরাং ডাক্তারগণ শিরাগুলি খুললেন এবং "এঞ্জোপ্লাষ্টি" (Angioplasty) করলেন। সেই সময়ে সাময়িকভাবে নিরাময় লাভ হলো। পরে যখন আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হলো তখন (ডাক্তারগণ) বললেন, এই শিরাগুলি খুলতে হবে তখন আমি কিছু বুঝতে পারিনি। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখার পর প্রথমবার এর অর্থ বুঝলাম যে, প্রথমেও শিরাগুলি বন্ধ ছিল। কাদিয়ান ও দিল্লীতেও কোন কিছু পাকস্থলীতে থাকতো না বমি হয়ে যেতো এবং ভীষণ কষ্টে ছিলেন তিনি। যা খেতেন তা বের হয়ে যেতো এইজন্যে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। সেই

সময় স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও ইহা বুঝতে পারছিলাম না যে, নর্দমা বন্ধ হয়ে যাবার অর্থ কি, কিন্তু এখানে আসার পর ডাক্তারগণ পিত্তের পাথর নির্ণয় করে অপারেশন করল। তারা অপারেশন ছাড়াই পেট সেলাই করে দিল আর আমাকে খবর দিল যে, পাকস্থলী ক্ষুদ্রান্ত্রের সাথে সম্পর্কিত নাড়ীভুড়ি বন্ধ আছে এবং সেইজন্যে বমি হচ্ছে। খাবার ভিতরেই যাচ্ছে না। আমরা ইহার পরিবর্তে নাড়ী কেটে সরাসরি পাকস্থলীর সাথে জুড়ে দিয়েছে এবং নাড়ী খুলে গিয়েছে সুতরাং ইহার পর খোদাতা'লার ফযলে ভালই চলে আসছিল। অতঃপর কেমোথেরাপী (Chemotherapy)র সময় আসল তখন ডাক্তারগণ দেখতে পেলেন দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা ও কষ্টের কারণে অভ্যন্তরের অনেক স্থান ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গিয়েছে। লিভারের একটি বড় অংশ ক্যানসারে নষ্ট হয়ে গেছে এবং সাড়া দিচ্ছিল না আর আশংকা ছিল যে, কিডনীর শিরাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে কোনো ধরণের কেমোথেরাপী করা যাবে না। আমি এই বিষয়ে অবগত হবার পর নিজ তরফ হতে ঔষধ দিতে শুরু করি এবং বিশেষ করে দোয়ার প্রতি গুরুত্ব দেই তার ফলশ্রুতিতে ডাক্তার Evans জানাল, Ducts are open, অর্থাৎ অন্ত্রগুলি খুলে গিয়েছে। সে আশ্চর্যের সাথে প্রকাশ করল যে, এই অন্ত্রগুলি কি ভাবে খুলে গেল ? তারা মনে করছিল এইগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি রূইয়াটি যখন ঘরে বর্ণনা করলাম মেয়েরা বলল, ইহার অর্থ কি এই যে, তিনি আরোগ্য লাভ করবেন। আমি বললাম, আল্লাহ ভালো জানেন, আমাকে তো অন্ত্রগুলি খোলার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং তা পূর্ণতা লাভ করেছে। (ইহা শুনে) ফায়েযা তা'বীর করল যে, ইহার অর্থ (অবস্থা) এখনও আশংকাযুক্ত। কেননা একটা অংশ পূর্ণ হয়েছে। (জিজ্ঞাসা করল) আল্লাহ্‌তা'লা আর কোনো সংবাদ দিয়েছেন কিনা ? আমি বললাম, এ সম্বন্ধে কোন খবর পাইনি। তারপর স্নেহের ফায়েযা একটি রূইয়া বর্ণনা করল যা স্পষ্ট ছিল এবং উহা শুনার পর দোয়ায় কোন ঘাটতি করিনি। খোদার ফযলে ভরসাও ছিল। কিন্তু পয়গাম পেয়ে গিয়েছিলাম যে, কি হবে। সে রূইয়াতে দেখেছে স্নেহের নাঈমা খোকার, যে এখানকার লাজনার উত্তম কর্মচারী এবং (আমার) বিবির সাথে তার গভীর সম্পর্ক এবং সর্বদা প্রত্যেক ক্ষেত্রে খেদমত করত, সে এসেছে আর আমার স্ত্রী ফায়েযাকে বলছে, তোমাকে জলসায় নযম পড়তে হবে এবং উহার জন্যে আমি তোমাকে প্রস্তুতি করাবো। তখন ফায়েযা বলছে, আমাকে "দুর্‌রে আদন" দেন আমি সেখান থেকে পাঠ করব। তিনি বললেন, না দুর্‌রে আদন থেকে পড়তে হবে না। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার একটি নযম আমি বেছে রেখেছি। একটি মেয়েলোক তোমাকে পড়ে শুনাবে তুমি তাই শুনাবে অন্যটা নয় ; কিন্তু তাতে আদেশ দেয়ার কোন চিহ্ন ছিল না। ফায়েযা মেয়েলোকটির নযম শুনে আশ্চর্যান্বিত হলো, যে সে নযম পড়ছে

اک نہ اک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے
چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضاء کے سامنے

(অর্থাৎ তোমাকে এক না এক দিন খোদার সামনে উপস্থিত করা হবে। নিয়তির সামনে কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই।)

সে বলছে এত সুন্দর ও প্রভাব সৃষ্টিকারী কণ্ঠ যে তার হৃদয়ের গহীনে বিঁধে যাচ্ছে এবং সমগ্র দেহে এক অদ্ভুত ধরণের প্রশান্তি এসে গেছে। ভীতিপ্রদ স্বপ্ন হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ মৃত্যুর সংবাদ ছিল তার সাথেই আল্লাহ্‌তা'লা প্রশান্তি দান করলেন। সে যখন আমাকে রূইয়া শুনালো তখন গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল।

অনেক আহমদী এমন রূইয়া পাঠিয়েছেন যাতে বাহ্যিকভাবে সুসংবাদ ছিল কিন্তু যারা রূইয়া (অর্থ) বুঝেন তারা জানেন এগুলির কোন অর্থ নেই। রূইয়াতে ছবির ভাষায় সংবাদ দেয়া হয় অথবা খোদাতা'লার বিশেষ ভঙ্গি যা খোদার তরফ হতে আগত রূইয়াকে ভিন্ন করে দেন। সুতরাং অধিকাংশ রূইয়াতে আমি দেখেছি, স্ত্রী খুব অসুস্থ, অত্যন্ত আশংকাজনক অবস্থা এবং হঠাৎ করে তিনি ভালো হয়ে গেছেন। এর অর্থ ভয়ঙ্কর খবর লুকায়িত। কেননা আমার অভিজ্ঞতা যে, কোন গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিকে হঠাৎ করে ভালো হতে দেখার অর্থ আরোগ্য নয় বরং মৃত্যু হয়ে থাকে। এমন রূইয়া অধিকাংশ সময়ে দেখেছি এবং কতিপয় রূইয়ার তা'বীর যারা দেখেছে তারা এমন করেছে যা (আসল) তা'বীর হতে ভিন্ন ছিল। উদাহরণস্বরূপ একটি মেয়ে অথবা কেউ নিজের মেয়ের একটি রূইয়া পাঠিয়েছে সে দেখছে এক জায়গায় লাজনার ইজতেমা সেখানে একজন আহমদী মহিলা দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করছেন যে, বিজ্ঞাপনে ছেপেছে মির্যা তাহের আহমদের স্ত্রী মৃত্যু বরণ করছে। আমি আমার মাকে বলছি, সেতো ইহার নীচে লিখিত أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ (আল্লাহ্‌ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়) পড়ে শুনায় নি। এই রূইয়ার অর্থ স্নেহাস্পদ ফায়েযা শুনার পর বুঝে গেছে এবং আমাকে বলল, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পিতার মৃত্যুর সংবাদ যখন দেয়া হয়েছিল তখন তাঁকে বলা হয়েছিল أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ যে ইন্তেকাল করছিল তার সম্পর্কে এই ইলহামটি ছিল না? (বরং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যে সান্ত্বনা ছিল)। ইহার দ্বারা আমি বুঝে গেলাম তারা (কন্যাগণ) বুঝতে পেরেছে। অনেক রূইয়াকে অর্থহীন মনে করে অথবা মনে করে আমরা এই তা'বীর করেছিলাম কিন্তু ফল অমুক হলো। বস্তুতঃ রূইয়ার জ্ঞান একটি গভীর তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞান এবং অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান। এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এবং খোদার কালামের নিদর্শনও পাওয়া যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন

بنا سکتا نہیں اک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز
تو پھر کیوں کر بنا تا نور حق کا اس پہ آساں ہے

(অর্থাৎ কোন কীট পতঙ্গের একটি পা মানুষের জন্য বানানো সম্ভব নয় তাহলে খোদার জ্যোতিঃ মানুষের জন্যে বানানো কিভাবে সহজ হতে পারে।)

আসলে ঐশী বার্তা নিজের মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখে এবং উহার (জানারও) এক নিজস্ব পরিচয় আছে। তবুও অনেক সময়ে ঐশী বার্তার তা'বীর বুঝা যায় না। ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা নিহিত থাকে। আমার ঐ রুইয়া যার মধ্যে শিরাগুলি খুলে যাবার সংবাদ ছিল এর আগে কিছুই (সংবাদ) ছিল না। ইহার মধ্যে এই প্রজ্ঞা নিহিত ছিল যে, (আমার) স্ত্রী প্রত্যেক দিন জিজ্ঞাসা করত আপনি কোন রুইয়া দেখেছেন কিনা এবং সর্বদা বলতেন, আপনার দোয়ায় আমি ভালো হয়ে যাবো। আমি এই প্রশ্নের উত্তরে অক্ষম ছিলাম। যখন খোদার তরফ হতে কোন স্পষ্ট সুসংবাদ ছিল না তখন আমার কিইবা বলার ছিল। ইহার দরুন তার মন ভেঙ্গে যেত যে, আমি কোন সুসংবাদ পাইনি। সুতরাং আমি তাকে ঐ রুইয়াটি বার বার বলে সান্ত্বনা দিতাম যে, আপনি তো জানেন কাদিয়ানে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, শিরাগুলি খুলে গিয়েছে। এখন দেখুন শিরাগুলি খুলছে। দুইজন ডাক্তার একই কথা বলছেন যে, প্রথম ডাক্তার বললেন হৃদপিণ্ডের শিরাগুলি খুলেছে এবং দ্বিতীয় ডাক্তারও ক্ষুদ্রান্ত্রগুলি খুলে যাবার কথা বলছে। পাকস্থলী যা এক ধরণের রান্না ঘর তা সাথে আছে কিন্তু অন্ত্রগুলি বন্ধ থাকার কারণে সেখানে ভালো খাবার থাকা সত্ত্বেও অন্যদিকে খাবার পৌঁছিল না। আমি বললাম, যখন এই সব কিছু পূর্ণ হয়েছে তখন চিন্তার কারণ কেন থাকবে? আমি এ ভাবে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসছিলাম যে, হে খোদা! আমাকে কিছু তো বল। (কুরআন মজীদ খুলার পর) যে আয়াতের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে সেই আয়াতই যেন আমার সংবাদ হয়। তখন যে আয়াতের উপর আমার দৃষ্টি পড়ে তা হলো ادخلوها بسلام امنين

তথায় তোমরা শান্তির সহিত নিরাপদে প্রবেশ কর। এই আয়াতের পূর্বে রয়েছে

ان المتقين فى جنت وعيون

নিশ্চয় মোত্তাকীগণ জান্নাত ও ঝরণাসমূহে থাকবে।

ইহাতে স্পষ্ট সংবাদ ছিল। ইহাতে আমার হৃদয়ে একটি কথা বিদ্ধ হয়ে গেল এবং উহা এই (আয়াতের) দরুন নয় বরং আমার এমনিতেই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি শুক্রবার মৃত্যু বরণ করবেন। সুতরাং পূর্বে এক জুমুআর দিন সংকটাপন্ন অবস্থা হল। কয়েক দিন পূর্বে তিনি সম্পূর্ণভাবে ভালো ছিলেন এবং শুক্রবারে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে। এবং বর্তমানে আবার বৃহস্পতিবারে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করে কিন্তু জুমুআর পূর্বে তার অবস্থার উন্নতি ঘটল এবং অত্যন্ত শান্তভাবে কথা বলছিলেন আর এই প্রশান্তিরও একটি কারণ ছিল। তা শুধু ব্যাধি (নিরাময়) সংক্রান্ত ছিল না বরং ঈমানের সাথেও সম্পর্কিত।

কিছুদিন পূর্বে হাসপাতালের ডাক্তারগণ আমাকে বলল যে, যেহেতু আপনি বলেছেন যে, ক্যান্সারের পরিবর্তে Growth বলার জন্য। আমরা এখনও ক্যান্সার সম্বন্ধে কিছুই বলি নি। আমি বলেছিলাম Growth বলবেন। Growthও এক প্রকারের ক্যান্সার এবং ইহা

মিথ্যা নয়। কিন্তু ক্যান্সার শব্দ ব্যবহার করবেন না। আগেই অর্ধেক হৃদপিণ্ড কাজ করছে এবং গুরুতর অসুস্থ, শুনলে মন ভেঙ্গে যাবে। (ডাক্তারগণ) ভালো সহযোগিতা করেছেন। সাধারণতঃ এমতাবস্থায় তারা সহযোগিতা করেন না কিন্তু তারা তবুও অনেক সাহায্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার মিস হারপার বললেন, আমার তো আর সহ্য হচ্ছে না। আমি আগামী কাল একে অবশ্যই এ ব্যাপারটি বলব। ইহাতে আমি বললাম, যখন তুমি বলতেই চাইছ তুমি নয় বরং আমিই বলব। তাকে আমি বললাম আগামীতে যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন তবে অবশ্যই তুমি বলতে পারো। কিন্তু আমি আশা রাখি আগামীতে তিনি আপনার কাছে আর জিজ্ঞাসা করবেন না। সুতরাং আমি তাকে ধীরে ধীরে বুঝাতে লাগলাম যে, আপনি অন্যকে জিজ্ঞেস করেন আপনার ক্যান্সার কি না। আপনি বলুন, ক্যান্সার কি এমন কোন ব্যাধি যা খোদাতা'লা ঠিক করতে পারেন না? যদি তিনি কাউকে মৃত্যু দিতে চান তাহলে কি তিনি ক্যান্সারের মুখাপেক্ষী। সর্দিতেও মৃত্যু হয়, মৌমাছি হুল ফুটালেও মৃত্যু ঘটে। হাঁচি দ্বারাও মৃত্যু ঘটে। কোন কারণ ছাড়াই যারা মৃত্যু বরণ করার থাকে মৃত্যু বরণ করে। আল্লাহ্‌ কাউকে নিতে চাইলে সহস্র লক্ষ কোটি কোটি রাস্তা আছে। আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই ক্যান্সার তো খোদা নয়। যদি আপনার পূর্ণ ঈমান থাকে এবং বিশ্বাস রাখেন যে, খোদা আছেন এবং খোদাতা'লা শক্তিমান তাহলে দোয়া করুন কিন্তু ক্যান্সারের প্রতি এত গুরুত্ব দিবেন না যেন ইহা এমন এক কষ্ট যার কোন চিকিৎসা নেই। অতঃপর আমি তাকে বুঝালাম আপনার চিন্তিত হবার একটি কারণ আছে আর তা হলো এই যে, আপনি দোয়া করছেন ও দোয়া করার পর তা গৃহিত হবার কোন কল্পনাই করছেন না। আপনি মনে করছেন যেভাবে আপনি দোয়া করছেন অথবা অন্যরা করছে সে ভাবেই যেন দোয়া কবুল হয়। আমি বললাম, ইহা খোদার পদ্ধতি নয়। আমি আপনাকে বুঝাচ্ছি যে, দোয়া এভাবে করা উচিত যে আগে নিজেকে খোদার কাছে আত্মসমর্পণ করুন এবং বলুন যে, হে খোদা! যেভাবে তুমি চাও আমি তাতেই সন্তুষ্ট। তোমার সন্তুষ্টির সাথে আমার হৃদয় একশত ভাগ সন্তুষ্ট থাকবে। আর এতে আমি নিশ্চিন্ত আছি, কোন অভিযোগ নেই। এখন আমার যাচ্‌ঞা তুমি এইরূপ করে দাও কিন্তু ফয়সালা যদি এই হয়ে থাকে যে, তুমি এই রূপ করবে না। তবু আমরা তোমারই। ইহা ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমি আবার বুঝালাম যে, দেখ আমাকেও তো চলে যেতে হবে। আমাদের সবাইকে যেতে হবে। ইহা তো একটি অটল বিধান। বাচ্চাদের নাম উচ্চারণ করলাম, ঘরে যে মেহমান ছিল তাদের সম্বন্ধে বললাম। প্রত্যেকের উপরই এমন এক সময় আসবে যখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় বিছনায় পড়ে যাবে। আমিও এই অবস্থায় পতিত হবো। আমার সন্তানরাও হবে এবং তাদের সন্তানরাও হবে। পূর্বের কি কেউ বেঁচে আছে যে, আপনি এই ধারণা করবেন যে, ইহা (মৃত্যু) টলে যাবে। একবার বল্লেন যে, মৌলবী হাসবে। আমি বললাম, যাদের ভাগ্যে (আযাব) রয়েছে তাদের জন্যে আমি কি করতে পারি। ঐশী তকদীরের উপর

কেউ বিদ্রূপ করলে ইহা তার দুর্ভাগ্য, কিন্তু এজন্যে আমি দোয়া করব না যেহেতু মৌলভী-গণ হাসবে তাই খোদা এমনটি করুন। আমি আপনাকে দোয়ার যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছি উহাই সঠিক এবং উহাই আমার পসন্দনীয়। ইহা শুনতে শুনতে তিনি অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়লেন। ধীরে বললেন, থামুন। বেশ বেশ অনেক হয়েছে! এবং বললেন, আমি খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি গুণাহ্ করেছি। ভুল হয়ে গেছে। হে খোদা! তুমি ক্ষমা কর। আমি আগামীতে আর কখনও এরূপ করব না। কারও নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব না। তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞার উপর কায়েম ছিলেন। এমন কি গতকাল মিস্ হারপার আশ্চর্য প্রকাশ করে কাউকে বললেন, আমি (হুযূর) তার সাথে আলাপ না করা পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করতেন, আমার ব্যাধিটি কি? আমি আরোগ্য লাভ করব কি? কিন্তু (আমার আলাপের পর) তিনি এমন নিশ্চিন্ত হলেন যে, তার মধ্যে চিন্তার কোন ছাপ ছিল না এবং কোন অস্থিরতারও প্রকাশ করেন নি। আমাকে জিজ্ঞেসও করেনি ও এ ব্যাপারে একটি কথাও বলেন নি। আমারও (এ বিষয়ে) কথা বলার প্রয়োজন হয় নি। খোদাতা'লার ফযলে আমার কথা বুঝার পর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে নিজ প্রতিজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি এবং গায়রুল্লাহ্র (আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও) দিকে দৃষ্টি দেন নি। শেষে এ অবস্থা হলো যে, তাকে কি সান্ত্বনা দিব বরং তিনি আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। আমাকে বললেন, আপনি শান্ত হোন, এত বেশী দুশ্চিন্তা করবেন না। এত দুঃখ করবেন না। আমি উত্তর দিলাম, বিবি আমি তো নিরূপায়। আমি তো দূরের লোকের কষ্টেও দুঃখিত হয়ে পড়ি। দূর দুরান্তেও কেউ অসুস্থ হলে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। কষ্ট তো আমার দম বের করে দিচ্ছে। পাকিস্তানে আহমদীদের উপর নির্যাতনের খবর পেয়ে যে কষ্ট পাই, এর পূর্বে আর কখনও তেমন কষ্টে পড়িনি। আপনি তো আমার নিকটে। আপনার কষ্টতো একবারে আমার চোখের সামনে ইহা কিভাবে সম্ভব যে, আমি তা উপলব্ধি করব না। হ্যাঁ, আল্লাহতা'লা ধৈর্যের তৌফীক দান করে থাকেন। আমার অনুভূতি তো আমার কাছে। আমি চেষ্টা করি যেন অন্য কেউ জানতে না পারে। কিন্তু এমন কথা বলুন আমি যেন কষ্ট না পাই। আমি বললাম, ইহা আমার সাধ্যের বাইরে। অতঃপর ইঙ্গিতে বললেন, ঠিক আছে। আমি বুঝে গেছি তবুও অনেক সময়ে বলতেন, ঘাবরাবেন না। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী অত্যন্ত কষ্ট ও বেদনাতে মৃত্যু বরণ করে তথাপি আল্লাহ্র বড়ই কৃপা তিনি শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত শান্ত ছিলেন। আমি বললাম, মেয়েদের ডেকে আনি, আমি তাদিগকে আসতেও বললাম, কিন্তু শেষে তিনি আসতে বারণ করলেন। (বললেন) তারা ঘাবরিয়ে যাবে। আমি বললাম, একথাটি মানব না। ইহা তাদের অধিকার। আমি অপারগ। তাদের অবশ্যই ডাকতে হবে। দেখা যাচ্ছিল তিনি নিঃশেষ হচ্ছেন। মেয়েরা আসল। তাদের সবাইকে বললেন, ঘাবরিও না। আমি ভালো

হয়ে যাবো। তারপর আমাকে বললেন, আপনি চলে যান। আপনি রোযা রাখতে যান। নামাযে যেতে হবে। আমি বললাম, আমি হয়ে আসছি। কিন্তু তিনি বললেন, আসতে হবে না। আমি বললাম, আমাকে তো আসতেই হবে। সুতরাং রাত বারোটার সময় শেষ খবর ডাঃ মুবাশ্বের এর তরফ হতে আসল যে, তাঁর অবস্থা গুরুতর। (ডাঃ মুবাশ্বের বহু খেদমত করেছেন)। আমি মেয়েদের সাথে নিয়ে সেই সময়েই রওয়ানা হয়ে গেলাম। রাস্তায় ট্রান্সমিশনে ডাঃ মুবাশ্বেরের কাছ হতে খবর পেলাম। আমি নীচে লিফটের কাছে অপেক্ষায় আছি। আমার সাথের মেয়েদের বললাম, কথা তো স্পষ্ট যদি অবস্থা গুরুতর হতো তাহলে মুবাশ্বের বিবির বিছানার নিকট হতে সরে যেত না। সে নীচে আছে তোমরা প্রস্তুত হও। আমার সাথে অঙ্গীকার কর তোমরা ধৈর্যের আদর্শ প্রদর্শন করবে। আর এরূপ কোন কাজ করবে না যাতে খোদাতা'লা অসন্তুষ্ট হন। আমি বললাম, আমরা পৃথিবীতে ধৈর্য শিখাতে এসেছি। আমরা যদি এ সমস্ত ছোট ছোট বিষয়ে এভাবে বিচলিত হয়ে পড়ি এবং কান্নাকাটি শুরু করি তবে তা ঠিক নয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, তাদের মাতাও অন্য আরেকজনকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তোমরা কান্নাকাটি করনা ধৈর্য ধারণ কর। অতএব খোদার ফযলে মেয়েরা অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে নিজেদের অঙ্গীকারে দৃঢ়চিত্ত ছিল। আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্‌ খোদা তাহাদিগকে দৃঢ়তা দান করবেন।

ইহা ছিল তার অসুস্থতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। একটি বিষয় আমার খুব ভালো লেগেছে তা হলো এই যে, একবার আমি বললাম, বিবি, আমি আপনার জন্যে অনেক দোয়া করছি, আপনি অনুমানও করতে পারবেন না যে, কিভাবে দোয়া করছি। তখন তিনি বললেন, শুধু আমার জন্যে দোয়া করবেন না। সমগ্র পৃথিবীর অসুস্থদের জন্যে দোয়া করুন। আরও অসুস্থ ব্যক্তি আছে। তারাও তো কষ্টে আছে। আমি বললাম, আমি আগেই তাদের জন্য দোয়া করে আসছি। ইহা কখনও হয় নি যে, আপনার জন্য দোয়া করছি আর দৃষ্টি সমগ্র পৃথিবীর অসুস্থদের প্রতি যায় নি। যে যে দেশে বিভিন্ন মহাদেশে যে সকল ব্যক্তি কষ্টে আছে আপনার কষ্টের কল্যাণ দোয়া রূপে সবার নিকট পৌঁছেছে। ইহা শুনার পর তার চেহারায় প্রশান্তি ছেয়ে গেল এবং বললেন, ঠিক আছে এভাবেই দোয়া করবেন।

যেমন আমি পূর্বে বর্ণনা দিয়েছি যে, শুরুতে লাজনার সাথে তার সম্পর্ক গভীর ছিল না কেননা তরবীয়তের পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। তথাপি আমার কাজের অনেক বোঝা তিনি বহন করেছেন। আমার সম্পর্ক (লোকদের সাথে) ব্যাপক ছিল, সব সময় মেহমানদের আসা যাওয়া ছিল। ঘরে বিভিন্ন মিটিং হতো। আমি অসময়ে সফরে চলে যেতাম। সকালে এক সফরে বের হয়েছি যে রাতে চলে আসব কিন্তু সেখান থেকেই বাংলায় (বাংলাদেশ) চলে গেলাম। কখনও কখনও দুই দুই তিন তিন সপ্তাহ পরে বাড়ীতে ফিরেছি কিন্তু কখনও অসহিষ্ণুতা দেখি নি। এই অভিযোগও করেন নি যে, আপনি আমার সাথে কিরূপ

ব্যবহার করছেন। আমাকে ছেড়ে চলে যান এবং কিছু বলেন না। আমি জামা'তের কাজ করতাম কিন্তু অনেক এমন বিষয় ছিল যা ঘরে ইঙ্গিতেও প্রকাশ করতাম না। এ পরিপ্রেক্ষিতে কখনও কখনও অভিযোগ করতেন যে, বিষয়টি সবাই জানে কিন্তু আপনি আমার কাছে গোপন করেছেন। আমাকে অমুকে বলেছে যে, আপনি অমুক কাজটি করেছেন এবং অমুক জায়গায় গিয়েছেন আমাকে বলেন নি। আমি উত্তরে বলতাম, আমি তো ঘরের বিষয়াদি এবং জামা'তের বিষয়াদি পৃথক পৃথক ভাবে দেখি। আমি পসন্দ করি না যে, জামা'ত হতে যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয় তার উল্লেখ ঘরে করি। এরূপ করলে (এ সমস্ত কাজে) পরিবারের প্রভাব বিস্তার হতে শুরু করে এবং বিভিন্ন সমালোচনা ও অন্যান্য কথা বার্তা শুরু হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমার কর্মে মন্দ প্রভাব বিস্তার হবার আশঙ্কা আছে। তিনি আমার এ কথাকে সব সময়ের জন্যে গ্রহণ করেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কখনও জামা'তের কোন কাজে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেন নি, জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ দেবারও চেষ্টা করেন নি। পরামর্শ দিয়ে থাকলেও তা নগণ্য বিষয়ে। উদাহরণ স্বরূপ ৪৯ নম্বর বিল্ডিং (মসজিদ ফযল সংলগ্ন গেষ্ট হাউস) ঠিক করতে হবে। মেহমান আসেন এবং অত্যন্ত নোংরা পড়ে আছে। সেখানে গিয়ে তিনি কাজও করেছেন। ধীরে ধীরে মহিলাদের সাথে তার সম্পর্ক বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে দেশ ত্যাগের পর এ সম্পর্ক আরও ব্যাপকতা লাভ করে। অষ্ট্রেলিয়া, ফিজি, সিঙ্গাপুর, ইউরোপের সকল দেশে। কানাডা ও আমেরিকা যেখানেই গিয়েছেন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং ইহা এমন এক বৈশিষ্ট্য যা প্রকৃতিগতভাবে তার মধ্যে ছিল। তার মধ্যে কোন লৌকিকতা ছিল না। কখনও নিজেকে বড় মনে করেন নি। সবার সাথেই সৌহার্দ্যের সাথে মিশতেন; বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের (আহমদী) মহিলাদের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল এবং বলতেন, (আমাদের উপর) তাদের অনেক কৃপা আছে। অনেক সেবা করেছেন। কিন্তু দুঃখ এই যে, অসুস্থতার কারণে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারছি না। কি আর করতে পারি? আমি সহ্য করতে পারি না যে, এই অবস্থায় তারা আমাকে দেখবে। এ জন্যে আমি সুস্থ হয়েই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করব। তাদেরকে খবর দিন যে, আমার হৃদয়ে তাদের জন্য সম্মান বোধ আছে। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমার অপারগতার দরুন আমি তাদিগকে (আমার সাথে সাক্ষাতে) বারণ করেছি। সুতরাং আমি লাজনাদিগকে যতটুকু সম্ভব খবর দিয়ে ছিলাম যে, বিবির সম্বন্ধে যেন তারা ভুল ধারণা না রাখেন। তাঁর এই ব্যবহার আপনাদের সাথে সম্পর্ক না থাকার দরুন নয় বরং সম্পর্ক থাকার কারণেই। কয়েকজন ছিলেন যাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা অথবা অসুস্থতার সময় ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যাদেরকে তিনি নিজের কাছে থাকতে দিতেন এবং বলতেন সেবার দায়িত্ব তাদেরকে দিয়ে দিন। তাদের মধ্যে একজন সম্ভবতঃ সর্দার রফিক সাহেবের বিবি ক্যাপ্টেন বুশরা নার্স ছিলেন। তিনি অনেক সেবা করেছেন। আরেকজন "ক্রাইডেন" এর লাইকা আহমদ ছিলেন। তিনিও দিনরাত সেবা করেছেন।

এই দুই জনের সেবার কথা সব সময় উল্লেখ করতেন। ইহা ছাড়াও আরো কিছু মেয়ে লোক ছিলেন যারা সেবার সুযোগ পেয়ে ছিলেন। ইফতেখার আইয়ায সাহেবের মেয়ে আমাতুল কুদ্দুস আইয়ায, যে মেডিকেলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। তার প্রতিও তিনি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। ডাক্তার হওয়ার কারণে সে অসুখটি সম্বন্ধে বুঝত, দ্বিতীয়ত: তার স্বভাব অত্যন্ত নম্র, সে মিষ্টিভাষী ও স্নেহময়ী ছিল। অত্যন্ত নম্রতার সাথে তাকে (স্ত্রীকে) বুঝাত যদ্দরুন তিনি (স্ত্রী) সন্তুষ্ট ছিলেন। অনেক সময় কুদ্দুস আমাকে বলত, আপনি আশ্চর্য হবেন অত্যন্ত ভালভাবে আমার সাথে কথা বলছিলেন। নিজের পুরনো দিনের কথা বলছিলেন এবং আপনার সাথে যে সফর করেছিলেন তার কথা বলছিলেন। এ সমস্ত বিষয়ে গল্প করতেন এই তিনজন মহিলা। অসাধারণ খেদমতের সুযোগ পেয়েছে। এদের ছাড়াও সাবিহা লুন, নাঈমা খোকার এবং আরও অনেকেই যে সময়েই কিছু সুযোগ পেয়েছেন তারা সেবা করেছে কিন্তু বাধ্যবাধকতার কারণে তারা বেশী সুযোগ পায়নি। বাইর থেকে এরা এসেছিলেন তাদেরকে শুরুতে অনেক বারণ করেছি। কেননা আমার মনে কষ্ট লাগত যে, লোকেরা আসবে এবং বিশেষ করে তাদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা জেনে যাবে যে, বিশেষ কিছু ঘটে গিয়েছে (যদ্দারা তারা কষ্ট পাবে)। যাই হোক ভাই বোনদের অধিকার তো আমি কেড়ে নিতে পারতাম না। সুতরাং কষ্টের সাথে তাকে (স্ত্রী) সাক্ষাতের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করাতে হয়েছিল যে, আমিতো তাদিগকে বারণ করেছিলাম ও বলেছিলাম যে, তোমাদের আসার কি প্রয়োজন রয়েছে। তারা (স্ত্রীর ভাই বোনেরা) অত্যন্ত জিদ করেছে যে, আমাদের মন তার সাক্ষাৎ করতে চাইছে আপনি কেন বাধা দেন? আমি কি তাদিগকে (সাক্ষাতের) অনুমতি দিব? শুরুতে তিনি (স্ত্রী) বলতেন, অনুমতি দিবেন না। কিন্তু আমার বারবার বিভিন্নভাবে বলার পর তিনি অনুমতি দিলেন। তখন তার (স্ত্রীর) ভাই নাসিম ও নাসিমের স্ত্রী সাবিহা এবং তার বড় বোন ও ফৌজিয়া কয়েকদিনের মধ্যে পৌঁছে গেলেন। আমার বোনেরাও আমার জন্য অনেক তাগিদ দিল কিন্তু আমি বললাম, তোমাদের আশা ঠিক হবে না তোমরা ওখানেই থাক। আমার বোনদের বিষয় ভিন্ন। আমার বোনেরাও পৌঁছুতে লাগল তারা বুঝতে পেরেছিল বিষয়টি অত্যন্ত সংকটপূর্ণ। আমাতুল জমিল, আমার বড় বোন আমাতুল কাইয়ুম যিনি ভাই মির্যা মোজাফফর আহমদ সাহেবের বিবি, পৌঁছে গেলেন। তারা গতকাল পৌঁছেছেন এবং সাক্ষাতও হয়েছিল। তাকে (স্ত্রী) দেখেও নিলেন। এই ছিল তার জীবন ও অসুস্থতার বৃত্তান্ত।

অনেক সময় তাকে (স্ত্রী) সান্ত্বনা দিবার জন্য যে সমস্ত বিষয় খুঁজে বের করতাম তার মধ্যে একটি হল এই, যা তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে শুনতেন। বলতাম যে দেখ, দুনিয়াতে তুমিই একজন রোগী যার জন্য এত লোক দোয়া করছে। খোদার কসম! সমগ্র দুনিয়াতে কোন এমন রোগী নেই যার জন্য এত ব্যাপকভাবে দোয়া করা হচ্ছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সবাই চিন্তিত। আমি বলতাম যে, আমার কাছে চিঠি আসে।

তুমি অনুমানই করতে পারবে না যে, সেগুলি কত বেদনায় ভরপুর। আশ্চর্য হতে হয় সাদা কালো প্রত্যেক রংএর লোক, দূরদেশের লোক কি রকম বিচলিত! তোমারই সৌভাগ্য তো আল্লাহ্‌র দান। তিনি (তোমাকে) কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, এ জন্যে আমি খোদার লাখ লাখ শুকর করি। শেষ সময়ে দোয়ার প্রতি পুণ্যের দিকে ও যিক্‌রে ইলাহীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি শেষ দিনগুলিতে সম্পূর্ণভাবে কোন দ্বিধা ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নিজের শেষ সময় তা বুঝতে পেরেছিলেন।

রাতে যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন কোন কষ্ট ছিল না। কথা বলছিলেন। আমারও খোদার নিকট এই প্রার্থনা ছিল যে, তাকে শান্তিতে মৃত্যু দিও। বুশরা নামক যে নার্সটি সাথে ছিল সে বলল, কথা বলছিলেন। কোন কষ্ট ছিলনা। অত্যন্ত শান্ত ছিলেন। কোন ব্যতিক্রম ছিল না। আমি দেখলাম তো ঘাবড়িয়ে বাইরে গেলাম। ডাক্তার এসে দেখলেন ও বললেন, তিনি তো মারা গেছেন। এইভাবে খোদাতা'লা আমার প্রার্থনাকে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি শান্তিতে বিদায় নিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ তার নামাযে জানাযা আগামীকাল ইসলামাবাদে যোহরের নামাযের পর হবে। এই নামাযে জানাযার সাথে আমি আরেকটি গায়েবানা নামাযে জানাযাও অন্তর্ভুক্ত করব। সেই নামাযে জানাযা এমন এক মহিলার যার জন্যে তা পড়ার এক বিশেষ কারণ আছে। আমাদের চৌধুরী মাহমুদ আহমদ চীমা সাহেব যিনি ইন্দোনেশিয়াতে স্থায়ীভাবে মুবাল্লেগ। তার স্ত্রী ফাতেমা বেগমের (আমার) বিবির মতই ক্যানসার অর্থাৎ পিত্তের ক্যান্সার ছিল যা কিনা মারাত্মক ক্যান্সার হিসেবে চিহ্নিত। এই বিষয়টি সামনে রাখুন; কিন্তু এরূপ করার আসলে আর একটি কারণ হয়েছে। তা হলো এই যে, হযরত ভাইজান (রহঃ)-এর স্ত্রী তাহেরা সিদ্দীকা নাসের সাহেবা আমাকে একটি স্বপ্ন লিখে পাঠালেন এবং লিখলেন যে, এই (স্বপ্নের) দরুন চিন্তিত যে, কোথাও হযরত ইমাম জামা'তে আহমদীয়া খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহঃ) আসছেন কিন্তু আমার দিকে কোন দৃষ্টি দিচ্ছেন না। একজন সাধারণ মেয়ের সাথে বিয়ে করছেন। বিয়ের পর তিনি তাকে নিজের সাথে নিয়ে যাচ্ছেন। (মেয়ের) পিতার নাম দোস্ত মুহাম্মদ। যখন রুইয়াটি পড়লাম তখন পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলাম যে, খোদার নিকট এত মর্যাদাবান সে কে যার জন্যে এক প্রয়াতঃ ইমাম সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং সেই ব্যক্তিটিও একজন সাধারণ মানুষ। আমি তাকে (স্বপ্নের) তাবীর লিখে পাঠাই। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এই ফাতেমা বেগম পড়েন। আমি লিখলাম, ইহাতে ফাতেমা বেগমের মৃত্যুর খবর। আপনার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। তার সাথে সাক্ষাৎ করুন ও সেবা শুশ্রূষা করুন ও আমার সালাম পৌঁছে দিন। সুতরাং তিনি তা করলেন ও আশ্চর্যের প্রকাশ করলেন যে ইহার কেমন তা'বীর করলেন। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি আদর্শ উৎসর্গকারী এবং অসাধারণ ধৈর্য-

শীল ওয়াকেফে জিন্দেগী মহিলা ছিলেন। তার স্বামী ওয়াকেফে জিন্দেগী ছিলেন। বৈবাহিক জীবনের ৪১টি বছরের মধ্যে মাত্র ১১টি বছর একত্রে ছিলেন। এবং ৩০টি বছর পৃথক ছিলেন। অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করেছেন। বৈবাহিক জীবনের ৪১টি বছর ষ্টাফ কোয়ার্টারে কাটিয়েছেন। তার চারটি কন্যা আছে। তাদের পড়ানো, লালন-পালন, দেখা শুনা, বিয়ে-সাদী ইত্যাদি সব কিছু নিজেই করেছেন। তার স্বামী তো আরেক জগতের লোক। তার স্ত্রী কন্যাদের লাভ ক্ষতির সম্বন্ধে তার যেন কোন খেয়ালই নেই। তিনিই (ফাতেমা বেগম) সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমি ওয়াকফে জাদীদে যখন হোমিওপ্যাথি (প্রাকটিস) করতাম তখন সেখানে প্রথমবারের মত আমার সাথে তার পরিচয় হয়। আর এইরূপ পরিচয়ের কারণ হল সেখানে ষ্টাফ কোয়ার্টারের রোগীরাই বেশী আসত। ফাতেমা বেগম তার এ কন্যাকে নিয়ে আসলেন যে কঠিন এলার্জিতে ভুগছিল। মেয়েটির নাম হয়তবা তৈয়্যবা চীমা অথবা আমাতুল হামীদ অথবা বুশরা অথবা সামীনা ছিল, আমার স্মরণ নেই। সামীনা তো হতেই পারে না সে তো অনেক অল্প বয়সের। তৈয়্যবা অথবা আমাতুল হামীদ-এর মধ্যে কেউ ছিল। সম্ভবতঃ তৈয়্যবা ছিল। সে BSc অথবা MSc তে পড়ছিল। সাইন্সের ছাত্রী ছিল। আমি অনেক চিকিৎসা করলাম কিন্তু আমার চিকিৎসার উপর তার বিশ্বাস ছিল তাই সে ক্রমাগত আসত এবং বলতো যা চিকিৎসা আছে তা করুন। পরে আল্লাহ্‌তালা তাকে অন্যের হাতে শাফা দান করেন। আমি সেই সময়ে তাকে নিকট হতে দেখেছি এবং তৎটুকুই পরিচিতি। বড়ই ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। কোন ধরণের কপটতা ও লৌকিকতা ছিল না। অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। জামাতের জন্য উৎসর্গকারী ছিলেন। দশ বছর পর্যন্ত লাজনার সদর ছিলেন। কুরআনে করীম পড়ানোর গভীর আগ্রহ ছিলো। নিজেও আগ্রহ সহকারে কুরআন শিখেছিলেন।

দোস্ত মুহাম্মদের সম্বন্ধে আমার মনে হলো তার পিতা অবশ্যই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী ছিলেন অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তি হবেন নতুবা তার নাম দোস্ত মুহাম্মদ বলা হত না। যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তখন জানা গেল তার পিতার নাম ছিল চৌধুরী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব, যিনি শিয়ালকোটের 'কিল্লা সুবা সিং' এর অধিবাসী ছিলেন। ১৯০৪ সনে ১৪ বছর বয়সে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করেছিলেন এবং সাহাবী ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও স্নেহাস্পদ লোক ছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময়ে তিনি আমীর ছিলেন। 'ঘাটিয়ালিয়া'তে কলেজ বানানোর সময় তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন। তিনি সেই যুগের লোক ছিলেন যখন পাটওয়ারীদের মধ্যে (গ্রাম সরকারের হিসাব রক্ষক) ওলীউল্লাহ্‌র সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ইহাও নিদর্শন যে, পাটওয়ারীকেও ওলীউল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন। তার (পাটওয়ারী সাহেবের) চারজন কন্যা ছিল, ফাতেমা বেগমেরও চার কন্যা এবং আমারও চার কন্যা আর ব্যাধিও এক।

সুতরাং এভাবে চিন্তার (গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়ার) আসল কারণের সৃষ্টি হয়। তার (ফাতেমা বেগম) পূর্ণ বিবরণ হস্তগত হয়েছিল কিন্তু কয়েকটি রুইয়া ও ঐশী খবরে জানতে পেরেছিলাম যে, আমার স্ত্রীর মৃত্যু নিকটে যেমন "জান্নাতে শান্তি ও স্বচ্ছন্দে প্রবেশ কর"। তাই চিন্তা করেছিলাম তার গয়েবানা নামাযে জানাযা স্ত্রীর নামাযে জানযার সাথে পড়াবো। একটি জানাযা উপস্থিত আছে আর অপরটি অনুপস্থিত। ইহার সাথে ওয়াকেফীনদের নসীহত করার সুযোগ পাবো যে, ইহাকে ওয়াকফ বলে। স্বামী ওয়াকেফকে জিন্দিগী হলেন অপরদিকে স্ত্রীও নিজের যৌবনকে খোদার দীনের জন্য কুরবান করে দিলেন। তার স্বামীকে দীনের খেদমতের জন্যে চিন্তা মুক্ত করে সকল বোঝা বহন করলেন। ইহার বিপরীত আজকের যুগে কিছু ওয়াকেফীন এমনও আছেন যাদের বিদেশে Posting হবার পর জামাতের বদৌলতে যখন সে দেশের নাগরিকত্ব পায় তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ইহাতে স্ত্রীদেরই ভূমিকা বেশী হয়ে থাকে। তারা নিজ নিজ স্বামীকে বলে, খেদমতের আর কি প্রয়োজন। যথেষ্ট হয়েছে। নাগরিকত্ব লও, অধিফা নাও আর সন্তানদের এখানে শিক্ষা দাও। জামাতে কি আছে? যদি কেউ মুখে নাও বলে তবে হাবভাবে তা বুঝিয়ে দেয়। তাহরীকে জাদীদের কয়েকজন আমাকে এ ব্যাপারে সাবধান করেছেন যে, আমি বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিচ্ছি। অনেক নম্র ব্যবহার করছি। ওয়াকেফীনদেরকে তাদের স্ত্রীদের সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত (বিদেশে) থাকতে দিচ্ছেন এরূপ হলে আশংকা আছে যে, তারা ওয়াকফ ছেড়ে দিবে। আমি তাদের সর্বদা এই উত্তর দিয়েছি যে, যারা খোদার (বান্দা) তারা খোদারই হয়ে থাকবে আর যারা খোদার নয় তারা পালিয়ে যাবে। আমাদের তাদেরকে ধরে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি খোদার (জন্য উৎসর্গকৃত) সে পালাবে না। তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাসও খোদার জন্যে হয়ে থাকে এবং বিশ্বস্ততার সাথে দীনের খেদমতের জন্য নিয়োজিত থাকেন। ইহাই প্রকৃত ওয়াকফ। কিছু সংখ্যক লোক ছিল যারা (ওয়াকফ) ছেড়ে দিয়েছে, তারা মনে করে যে, তারা চালাকী করেছে কিন্তু তারা শুধু নিজের আত্মাকে ধোকা দিয়েছে। তারা নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধে প্রতারণা করেছে। নিজের আত্মাকে ধোকা দিয়েছে, নিজ সন্তান-সন্ততি ও জীবনকে ধ্বংস করছে। তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। ধর্মও রইল না দুনিয়াও রইল না। যারা বিশ্বস্ত এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে সেবায় নিয়োজিত তাদেরই ওয়াকফ কবুল হয়। এ ব্যাপারে স্ত্রীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং এইরূপ (স্ত্রীগণের ব্যাপারে) ইতিহাস নীরব থাকে। সুতরাং আপনারা আশ্চর্যান্বিত হবেন না যে, কেন আমি আজ বিশেষভাবে এ ব্যাপারটি তুলে ধরলাম। আমি বলতে চাই, আহমদীয়াতের ইতিহাসের কিছু পাতা কালো কালি দ্বারা লেখা হচ্ছে এবং ইতিহাসের অনেক অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা যা বাহ্যিক চোখে দেখা যাচ্ছে না? কতই না এমন স্ত্রী রয়েছেন যারা স্বামীদের ব্যতিরেকে নিজেদের যৌবন অতিবাহিত করেছেন। তারা জীবনের আরাম আয়েশকে পরিত্যাগ করেছেন এবং ধৈর্যের সাথে নিজের কষ্টকে নিজের বুকে লুকিয়ে

রেখেছেন। তারা বিশ্বস্ততার সাথে দীনের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। বয়াতের অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ওয়াকফের অঙ্গীকারের উপর শুধু যে নিজেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা নয় বরং নিজ স্বামীগণকেও প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। যখন তাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখেছেন দাঁড়িয়ে গেছেন এবং বলেছেন খবরদার। ইহা সেই রাস্তা যেখান হতে ফেরার কোন পথ নেই। এমন লোকদের কথাও তো ইতিহাসে থাকা প্রয়োজন। আমি মনে করলাম ইহাই সময়। শুধু আমার স্ত্রীরই হক নয়। আরও ওয়াকেফীনে জিন্দেগী আছেন যাদের স্ত্রীগণ বড় বড় ত্যাগ ও কুরবানী করেছেন। তাদেরও অধিকার আছে যে, তাদের নাম ইতিহাসে জীবিত থাকুক, তাদের জন্যেও দোয়া করতে হবে। বিষয়টি দুষ্কর এজন্যে যে, যখন এমন কিছু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় (মেয়েদের ব্যাপারে) তখন কিছু বাড়িয়ে বলা হয়। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কিছু লৌকিকতাও এসে যায়। এজন্যে আমি এ পর্যন্ত ইহার ব্যবস্থা করি নি। কিন্তু এখন আমি বলছি, ঐ সমস্ত লোক যারা এমন নিষ্ঠাবান মহিলাদের সম্বন্ধে জানেন তারা জীবিত হোক অথবা মৃত তারা যেন তাদের জীবন-বৃত্তান্ত লিখে তাহরীকে জাদীদের অফিসে প্রেরণ করে যাতে তাদের নাম দোয়ার জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। আল্লাহ্‌ তা'লা কারও বাহ্যিকভাবে বলার উপেক্ষা রাখেন না। তাঁর নিকট ওয়াকেফীনগণের এই সকল পবিত্র স্ত্রীগণও ওয়াকেফীন হিসেবেই চিহ্নিত হবেন। তাদের কল্যাণ আগামীতে তাদের বংশধরগণও পেতে থাকবেন।

আমি এখন খুতবাকে শেষ করব। আমার স্ত্রীর তরফ হতে সবাইকে সালাম। কেননা তিনি বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যে, কতই না সুন্দর এই জামা'ত! এই জামা'ত আমার জন্যে কত দোয়া করছে। আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের রহমতের সাগরে নিমজ্জিত করুন, আমাদের পরিণাম উত্তম করুন এবং আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের বংশধরদের পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। দীনের সেবা করার সুযোগ যেন এরাই শুধু না পায় কিয়ামত পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় সুযোগ পেতে থাকে। আমীন।

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

শুনাতেই সওয়াব

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মোমেন দ্বিধাহীন চিত্তে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ্‌র গুণাবলী যে চিরন্তন তাও তার বিশ্বাসের অচ্ছেদ্য অংগ। নবী রসূলগণ এবং তাঁদের মারফত প্রেরিত কিতাবাদির ওপর সে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখে। নির্ভেজাল নিচ্ছিদ্র বিশ্বাসের সাথে সে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নেও সামগ্রিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, সব নবী রসূলই পথভ্রষ্ট মানুষকে মোমেন বানাতে আসেন। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শ্রেষ্ঠ মোমেন সৃষ্টি করতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর উম্মতভুক্ত মোমেন হতে হলে কুরআন পাকের শিক্ষা ও আদর্শকে নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ অনুকরণ করেই পালন করতে হবে। এর ব্যতিক্রম না হয় সেজন্য সদা সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে। এজন্য রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলীর সাথে সঠিক পরিচয় রাখতে হবে। সমাজে তা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াশে সদা রত থাকতে হবে।

রবিউল আউয়াল মাস মুসলিম জাহানে সেজন্যে বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এ সুযোগের অপব্যবহার হচ্ছে। এ কথা শুনে অনেকে হয়ত আঁৎকে ওঠবেন। কিন্তু বাস্তবে যা হচ্ছে তাতো আঁৎকে ওঠাতে থেমে যাবে না। এই চান্দ্র মাসে দেশ ব্যাপী শত শত ওয়াজ মাহফিল ও সীরাতন্নবী (সাঃ)-এর জলসা হয়ে থাকে। এসবে প্রায়ই দেখা যায় রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনের সাথে দূরত্ব সম্পর্কও রাখে না এমন সব উদ্ভট কেচ্ছা কাহিনী ছড়ানো হয়। অথচ এসবকে অযথা হুযুর পাক (সাঃ)-এর জীবনের অংগ বলে জোর গলায় প্রচার করা হয়। অসংখ্য গাল-গল্পের মাত্র দু একটির উল্লেখ করছি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঘাম, মলমূত্র সব কিছুই নাকি সুগন্ধে ভরপুর ছিল। সাহাবাদের অনেকেই হুযুর (সাঃ)-এর হুকুম ছাড়াই প্রস্রাব খেয়েছেন এবং সাত পুরুষ পর্যন্ত ঐ সুগন্ধের অধিকারীও হয়েছেন। কোন এক ইহুদী হুযুর (সাঃ)-এর কাছে এসে বল্লো, আমার মুষ্ঠিতে কি আছে যদি আপনি বলতে পারেন তবে বুঝবো আপনি সত্য নবী। হুযুর (সাঃ) বল্লেন—তোমার মুষ্ঠিতে যা আছে সেটি নিজেই যদি নিজের পরিচয় দেয় তবে কি হবে? তবে তো আপনার নবুওয়ত সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকবে না। এ কথা বলা মাত্রই ইহুদীর হস্তস্থিত মৃত টিকটিকিটি হতে আওয়াজ উঠলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'। সাথে সাথেই ঐ ইহুদী কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। এ বয়ানের পর বক্তা মাহফিলের সবাইকে লক্ষ্য করে বলে, পড়ুন সুবহানাল্লাহ্! এই পবিত্র উচ্চারণে তখন চতুর্দিকে মুখরিত হয়ে ওঠে। জানি না শ্রোতারা এতে মাহফিলের সার্থকতার সন্ধান পায় ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করে কি না। তবে কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি এসব শুনাতেই সওয়াব। এ সওয়াব খুবই নিম্নমানের এ উপলব্ধ

জাগ্রত করতে হবে। বিশ্বনবী (সাঃ)-এর এক নগণ্য উম্মতও এরূপ জীর্ণশীর্ণ ধ্যান ধারণায় ডুবে থাকতে পারে না। ঐশী ইচ্ছা ও আদর্শকে জীবনে নিষ্ক্রিয় রেখে এ ধরণের সওয়াবকে প্রাধান্য দেয়া কল্যাণপ্রসূত কি না এ জিজ্ঞাসা আর কতকাল এড়ানো যাবে?

এসব বিষয়ে যৌক্তিক প্রশ্নাদি করে লাঞ্ছিত হয়ে মাহফিল ছাড়তে হয়েছে। যেমন জিজ্ঞেস করেছি—রসূল করীম (সাঃ) তো কাকেও শিখিয়ে যান কি কিভাবে আমরা আমাদের ঘাম, মলমূত্র সুগন্ধি সৃষ্ট করতে পারি। বাস্তবে তা' করতে পারলে পৌর সভাগুলো ও পৌরবাসীরা, এমনকি গ্রামবাসীরাও অনেক যন্ত্রণা হতে সহজেই রেহাই পেতো। অপর দিকে এ যুগে তো নবী করীম (সাঃ)-এর ঘাম প্রস্রাব এসব খাওয়ার কোন পথ নেই। সুতরাং এ ধরণের নসিহত আমাদেরকে কিভাবে ফায়দামন্দ করবে? যে নবী (সাঃ) মৃত টিকটিকি দ্বারা ইসলাম প্রচারে সাফল্য লাভ করলেন আমাদেরকে এ ধরণের হেকমত শিখিয়ে গেলে এতদিনে হয়ত দুনিয়াতে মুসলমানদের সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেলা যেতো। এসব মোটা প্রশ্নাদিরই উত্তর পাইনি। পেয়েছি হুংকার আর মাহফিল হতে বহিষ্কারের কঠোর নির্দেশ।

এ অবস্থাকে কিছুতেই স্বীকার করে নিয়ে নিষ্ক্রিয় হলে চলবে না। এর আমূল পরিবর্তনের জন্য আমাদের কার্যকর ও বাস্তবধর্মী ব্যবস্থাদি নিতে হবে। তাই সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিতে আমাদের কেচ্ছা-কাহিনীর অসারতা প্রতিপন্ন করার সাথে সাথে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী চর্চায় তাঁর মহান ও পবিত্র জীবনের ঘটনাবলীর তাৎক্ষণিক ও বর্তমান তাৎপর্য তুলে ধরতে হবে। 'শুনাতেই সওয়াবের' মনমানসিকতায় প্রচণ্ড নাড়া দিতে হবে। সওয়াবের সীমানা যে শুনাতে সীমাবদ্ধ নয় বরং শুনা ও জানাকে কাজে রূপ দিলে এর ভিত দৃঢ়তর হয় ও গুণগত মান বাড়ে তা বুঝতে হবে। অবশ্যই সে শোনা ও জানার মূল উৎসই হবে কোরআন পাক যার বাণী শুধু অভ্রান্তই নয়, অপরিবর্তিতও। কেননা আল্লাহ্‌ই এর হেফাযতের ভার নিয়েছেন।

এ মহান দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে। এ জামাতের সদস্য হিসেবে আমাদের চতুর্দিকে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকেবহাল থাকতে হবে। এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনাকে সদা সম্প্রসারিত করতে হবে। কেননা বিশ্বনবীর উম্মত কখনও কূপমণ্ডুকতার শিকার হতে পারে না।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের কর্মসূচীতে ত্রিধারার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটাতে হবে:

(১) রসূল করীম (সাঃ)-এর সীরাতের নামে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত জঞ্জাল সাফাই করা।

(২) সঠিক সীরাতকে পুনর্জীবিত ও পুনর্বাসিত করা। উভয় কাজের জন্য চাই ক্ষুরধার যুক্তির সাথে প্রামাণ্য তত্ত্ব ও তথ্যাদির সংযোগ।

(৩) হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মানুষকে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাতে হবে। আমাদের উচ্চারণ ও আচরণে অমিলের কোনই স্থান থাকবে না। ঈমান ও আমলে সংযোগ ও সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমেই দূর হবে সব দুর্বলতা সব ব্যর্থতা। আল্লাহ্‌র অসীম ও করুণায় সার্থক হয়ে উঠবে আমাদের সব প্রার্থনা সব প্রচেষ্টা।

'মোহাম্মদ' একটি ভবিষ্যদ্বাণী

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

মূসা নামের অর্থ—পানি থেকে যাকে উঠান হয়েছে। ইসহাক—অর্থ হাসি। ইয়াকুব অর্থ—বাইবেলের মতে প্রতারক, প্রবঞ্চক। ইসলামের প্রকৃত অর্থ কি তা বাইবেলে লেখা নেই।

ফেরাউন পরিবারের এক মহিলা বনী ইস্রাঈলের এক শিশুকে সিন্দুকে নদীতে ভাসতে দেখে তাকে উঠিয়ে এনেছিলান সেই কারণে শিশুটি মূসা নামে পরিচিতি লাভ করে। ইসহাকের জন্মের সংবাদ লাভ করে তাঁর মাতা সারা হেসেছিলেন বলেই নাকি এই নাম। ইয়াকুব তাঁর পিতা ইসাহাককে এয়াশু সেজে প্রতারণা করার ফলেই নাকি এই নামকরণ। অবশ্য এই প্রতারণার পূর্বেও তাঁর নাম ইয়াকুব ছিল বলে বাইবেল উল্লেখ করেছে। বাইবেলে বর্ণিত এইসব নামের মধ্যে কোন গভীরতা নেই। এই সব নাম কেউ সুচিন্তিতভাবে রাখেনি। মনে হয় অত্যন্ত হেলায় খেলায় এই নামগুলির প্রচলন হয়ে গেছে।

মহানবী বিশ্ব নবীর নাম মোহাম্মদ (সাঃ)। এ নামে মানুষ আরো ছিল পূর্বকালে। কিন্তু মহানবীর (সাঃ) সময়ে সমগ্র আরব দেশে এই নামটির প্রচলন ছিল না। ঐ সময়ে এই নামটি ছিল পরিত্যক্ত, অপ্রচলিত। মনে হয় এই নামটিকে যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি রিজার্ভ রেখে দিয়েছিল এক প্রতিশ্রুত জনের জন্য। যে প্রতিশ্রুত পুরুষকে হাজার হাজার বৎসর পূর্বে মোহাম্মদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মোহাম্মদ অর্থ—প্রশংসিত।

বাইবেলে তাঁকে 'মোহাম্মাদিম' বলা হয়েছে। বাইবেলের অনুবাদকরা এর অর্থ করেছেন 'সর্বতোভাবে মনোহর'। যদিও মোহাম্মদ অর্থ মোহাম্মদই যা 'হামদ' শব্দ থেকে জাত। হাম্‌দ অর্থ প্রশংসা। যাই হোক অনুবাদে 'সর্বতোভাবে মনোহর' শব্দটিও প্রশংসামূলক। ভারতীয় শাস্ত্রে কোথাও বলা হয়েছে—নরাশংস। অর্থাৎ নর বর্তৃক প্রশংসিত। এই মহামদের আবির্ভাব হবে মরু স্থলে। তাঁর বাহন হবে উষ্ট্র।

পবিত্র কোরআন শুরু হয়েছে—'আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দিয়ে। অর্থাৎ সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহ্‌তা'লার জন্য। মোহাম্মদ (সাঃ) রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি, তাঁর সিফতসমূহের বিকাশ, রহমতুল্লিল আলামীন, জগৎসমূহের জন্য মূর্তিমান করুণা। তাই তাঁর নাম মোহাম্মদ (সাঃ)—সকল প্রশংসার মূর্তিমান রূপ। সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর বিকাশস্থল। তাই তিনি মোহাম্মদ (সাঃ)। তাঁর প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা করেছেন। খুলুকিন আযীম, তা হা, উসওয়ায়ে হাসানা বলে। তাঁর প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ বেদ, বাইবেলে। তাঁর শত্রু মিত্র সবাই বলেছে তাঁকে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত। আবুজাহল, আবুলাহাব, উতবা, ওলীদের মত শত্রুরাও

তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে তাঁর প্রশংসা কীর্তন হচ্ছে। বার্ণাড শ, লেমার্টিন, কারলাইল, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র নাথ, এম, এন, রায়, এ্যানি বেসান্ত সহ অসংখ্য হিন্দু, খৃষ্টান, আস্তিক, নাস্তিক তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁর স্তুতিগাঁথা গেয়েছেন। এই ধারা যুগ যুগ ধরে চলবে কিয়ামতকাল পর্যন্ত। এই স্তুতিপ্রবাহ কখনও থামবে না, বন্ধ হবে না। শত শত মুখে, সহস্র কণ্ঠে, ধ্বনিত হবে 'মারহাবা ইয়া মোহাম্মদ মারহাবা'। মানবতার মুক্তিদূত নবী সম্রাট মোহাম্মদ মোস্তফা নামেও মোহাম্মদ, কাজেও মোহাম্মদ।

মোহাম্মদ হি নাম মোহাম্মদ হি কাম,
আলাইকাস সালাতু আলাইকাস সালাম।

এই হইল সাধারণের প্রশংসা। জনতার দ্বারা গুণকীর্তন। নরাশংস বা মানব কর্তৃক প্রশংসিত। এই প্রশংসা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে আল্লাহ্ প্রেরিত আহমদ (আঃ) দ্বারা। আল্লাহ ও রসূলের গুণকীর্তনের ফলেই তিনি আহমদ নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। আহমদ অর্থ— প্রশংসাকারী। মহানবীর (সাঃ) আধ্যাত্মিক সন্তান, তাঁর বিকাশ, তাঁর শ্রেষ্ঠ গোলাম আহমদ (আঃ) সমগ্র জীবন ব্যাপী কলম ও বাক্যের মাধ্যমে তাঁর গুরু ও প্রভুকে 'মকামে মাহমুদে' প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সুলতানুল কলম খেতাব প্রাপ্ত আহমদ (আঃ) তাঁর অসংখ্য রচনায় নবী করীমের (সাঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে জগতের সামনে উজ্জল রূপে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু তিনি এত গুণগান করেও তৃপ্তি লাভ করেন নি। তিনি বলেছেন,—

মাদাহতু ইমামাল আম্বিয়ায়ে ওয়া ইন্নাহু
লা আরফাউ মিম মাদহি ওয়া আলা ওয়া আকবারু।

—আমি নবী সম্রাটের প্রশংসা কীর্তন করেছি বটে, তবে তাঁর মকাম আমার প্রশংসারও বহু উর্ধ্বে। তাইতো আমরা নিয়ত প্রার্থনা করি তাঁকে 'মকামে মাহমুদে' পৌঁছাবার জন্য। এই মকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থান অনন্ত, অফুরন্ত। তাইতো হযরত আহমদ (আঃ) বলেন,

খোদার পরে মোহাম্মদের প্রেম যদি হয় কুফরী সম,
খোদার কসম, সেই প্রেমেতে কাফের আমি প্রধানতম।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি হযরত আহমদের (আঃ) এই ইশ্‌ক দেখে নিরস মোল্লারা তাঁকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে। ধন্য এই কাফের, ধন্য এই কুফরী! আল্লাহ্‌র প্রাপ্ত হাম্‌দ এর বিকাশই তো মোহাম্মদ।

মোহাম্মদের (সাঃ) জীবনে তাঁর নিজের নামের সার্থকতাই শুধু প্রকাশ পায় নি বরং তাঁর মহান পিতৃ পুরুষদেরও নামের সার্থক রূপ আমরা মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যে দেখতে পাই। তিনি ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর অধঃস্তন পুরুষ। ইব্‌রাহীম অর্থ মানব জাতির পিতা। মোহাম্মদ (সাঃ) এই নামের বিকাশ। কেননা তিনি সকল নবী ও বিশ্ব মুসলিমের আধ্যাত্মিক পিতা। তাঁর সহধর্মিণী আমাদের মাতা, উম্মুল মুমিনীন। তিনি—আবা আহাদি মমির রিজালিকুম—অর্থাৎ মানুষের দৈহিক পিতা নন বটে তবে আধ্যাত্মিকভাবে তিনি সকল নবী ও উম্মতের পিতা খাতামুন্নাবীঈন (সাঃ)। তিনিই সেই নবী যিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে

মিল্লাতে ইব্‌রাহীম বলেছেন। ইব্‌রাহীমের (আঃ) প্রার্থনার ফল তিনি। তাঁর অপর পূর্ব পুরুষের নাম ইসমাঈল (আঃ)। ইসমাঈল অর্থ আল্লাহ্‌ শ্রবণ করলেন। ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈলের (আঃ) দোয়ার পূর্ণতা স্বরূপই যে মুহাম্মদের (সাঃ) আবির্ভাব তা আমরা পূর্বেই বলেছি। মহানবীর (সাঃ) বংশ হল কোরাইশ। কোরাইশ অর্থ এক প্রকার মাছ যা অন্য মাছকে খেয়ে ফেলে এবং চারদিক থেকে এসে মিলিত হওয়া। অর্থাৎ মহানবীর (সাঃ) আবির্ভাবের ফলে সকল ধর্ম ইসলামের মধ্যে বিলুপ্ত হবে। সকল ধর্মের মানুষ এই বিশ্ব ধর্মে একত্রিত হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী বিশ্ব সমাজ। ফালা ইউয্‌হিরাহু আলাদ্‌ দীনে কুল্লেহি। সকল নদী যেমন সাগরে গিয়ে নাম হারায়, তেমনি সকল নবীর উম্মত ইসলামে দীক্ষিত হয়ে এক সার্বজনীন নামে খ্যাত হবে।

নবী করীমের (সাঃ) পিতার নাম আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাস। মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) সমগ্র জীবন এই নামের বিকাশস্থল। তিনিই ছিলেন—আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। তাঁর জীবন যাত্রার প্রতিটি ক্ষণ ছিল স্রষ্টার স্মরণে নিয়োজিত। প্রতি পদে পদে তিনি আল্লাহ্‌কে স্মরণ রেখেছেন। সকল কর্মে তাঁর দোয়াই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে ভোগে, ত্যাগে, জীবনে মরণে, নিদ্রায়, জাগরণে, গৃহে, যুদ্ধে সর্বাবস্থায় তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র আব্দ। তাঁর জীবনে আল্লাহ্‌র মোহর অঙ্কিত ছিল বলেই তিনি খাতামুন্নাবীঈন। তাই আল্লাহ্‌র তৌহীদের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়ে আছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মোহাম্মদ মার্কা আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌ মার্কা মোহাম্মদ মানব জাতির মুক্তির সনদ (বিশ্ব নবী দ্রষ্টব্য)।

মহানবীর (সাঃ) মায়ের নাম আমিনা অর্থাৎ শান্তির আকর। এই শান্তিই ইসলামের মূলমন্ত্র। মোহাম্মদ (সাঃ) শান্তি স্থাপনের জন্যই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌কে পেশ করেছেন সালাম বা শান্তিরূপে। তাঁর ধর্ম ইসলাম। পবিত্র কাবা দারুল আমান তাঁর মুখে সদা উচ্চারিত হত আস্‌সালাম, আস্‌সালাম। তাঁর আহ্বান ছিল—ইলা দারুস সালাম বা শান্তি কেন্দ্রের দিকে, প্রকৃত শান্তি নিকেতনে।

তাঁর দুধ মায়ের নাম ছিল হালিমা। হালিমা অর্থ সহিষ্ণু। মহানবীর (সাঃ) সহনশীলতার কোন তুলনা নেই। তিনি সকল অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্যাতন হাসি মুখে সহ্য করেছেন। দুঃখ পেয়েও পরম শত্রুকে ক্ষমা করেছেন। মার খেয়েও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। হাতে পেয়েও শত্রুকে বলেছেন, লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা। শত্রুকে নাগালে পেয়েও বলেছেন "যাও তুমি মুক্ত!" পরমত সহিষ্ণু ছিলেন তিনি। তাঁর শিক্ষা—লা ইকরাহ ফিদ্দীন। মানশায়া ইউমিন ওমান শায়া ইয়াকফুর। ওয়া ইম্মা শাকেরাও ওয়া ইম্মা কাফুরা। তিনি ঘোষণা করেছেন—ফালাতুকাতেলু ওয়া আফু। হত্যা নয়, হত্যা নয়, ক্ষমা—শুধু ক্ষমা।

দুনিয়ার অপর কোন নবী বা মহামানবের নামের মধ্যে এহেন ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত নেই। পিতৃ পুরুষ, বংশ, পিতামাতা সকলের নামের সার্থকতা কি অন্য কোন মানুষের জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছে? না, এটি একমাত্র মোহাম্মদের (সাঃ) বৈশিষ্ট্য। এই সব নাম করণের মধ্যে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে জানতে পারি, বুঝতে পারি। যুগ যুগ ধরে এই পরিকল্পনা রূপ লাভ করতে করতে খাতামুন্নাবীঈনের (সাঃ) মধ্যে এসে বলেছেন, আদম (আঃ) যখন কাদাও পানির মধ্যে ছিলেন তখনও আমি খাতামুন্নাবীঈন ছিলাম।" আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা নাবীয়েকা দায়েমান ফি হাজিহিদ দুনিয়া ওয়া বা'সিন সানী।

সমস্যার সাহারা সমাধানের বনানী

কে, এম, মাহমুদুল হাসান

লোকমুখে একথা সদাই ভেসে বেড়াচ্ছে যে,—বর্তমান কালটাই হলো মানবতার মস্ত পরাজয়ের যুগ। দেশে দেশে কি যে দুর্বিসহ অবস্থা! সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাই থেকে প্রকাশিত ১৪ই আগষ্ট, ১৯৯২ ইং সংখ্যা Gulf News পত্রিকায় আফ্রিকার দেশে দেশে ভয়াল দুর্ভিক্ষের নিম্ন বর্ণিত তথ্য দেয়া হয়:

	দেশের নাম	দুর্ভিক্ষ পিড়ীত মানুষের সংখ্যা
১।	সুদান	৭০০ মিলিয়ন
২।	ইথিওপিয়া	৬.০০ ,,
৩।	ইরিত্রিয়া	২.৫০ ,,
৪।	জিবুতি	০.১০ ,,
৫।	উগাণ্ডা	০.২০ ,,
৬।	কেনিয়া	১.২০ ,,
৭।	সোমালিয়া	৪.৫০ ,,
৮।	মালাবি	৫.৭০ ,,
৯।	জিম্বাবুয়ে	৬.৫০ ,,
১০।	মোজাম্বিক	৩.১০ ,,
১১।	সোয়াজিল্যাণ্ড	০.২৫ ,,
১২।	লেসোথো	০.১০ ,,
১৩।	এঙ্গোলা	১.৩০ ,,
১৪।	নামিবিয়া	০.২৫ ,,

এসব দেশের মধ্যে সোমালিয়াতে তো পাঁচ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের এক চতুর্থাংশই মারা গেছে। অথচ পাশাপাশি এই খবরটি দেখুন, "দেশে মুমূর্ষু মানুষের জন্য খাদ্য আসতে পারছে না, অথচ অস্ত্র আসছে।" —(সোমালিয়া দুর্ভিক্ষ, দৈনিক সংবাদ: ২৩-৮-৯২) অর্থাৎ এটি খুবই স্পষ্ট যে, তথাকথিত শক্তিমানরা মানবতার ভয়াল পরাজয়কে ক্ষমাহীন ও ঔদাসীন্যের সাথে প্রত্যক্ষ করছে। বিভিন্ন দেশে কম জনপ্রিয় সরকারগুলো বেশী নির্যাতন চালিয়ে গদির মেয়াদকে টেনেটুনে লম্বা করতে চাইছে।

নীতি, ন্যায়বিচার এবং বিবেকের প্রতি যে মহা উপহাস দুনিয়া জোড়া করা হচ্ছে তা দেখে আদিম বর্বর মানুষেরাও লজ্জায় জিভে কামড় দেবে। সম্প্রতি ইউরোপের মুসলিম দেশ

বোসনিয়ায় কমপক্ষেও এক লক্ষ মানুষ মারা গেছে। সে দেশে ধর্ষিতা মুসলিম রমণীরা জানায়, "সার্বিয়ারা তাদের দশ দিন আটকে রেখে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।..... প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনকেই হত্যা করা হয়।" (সংবাদ : ২৪-৮-৯২ ইং) শুধু মুসলিম নিধনই নয়, মসজিদ নিধনও চলেছে সমান তালে। সেদেশের প্রিজেডোর এলাকার সামরিক শাসক সিমোভর-লজাকা বলেছেন, "কেবলমাত্র মসজিদের মিনার ধ্বংস করলেই চলবে না। মসজিদের ভিত্তি পর্যন্ত মিশিয়ে দিতে হবে। এর অর্থ হবে তারা আর একটি মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে না।" (সংবাদ : ২৪-৮-৯২ ইং) এ অত্যাচার গেষ্টাপো (গেহেইম ষ্টাটাস পৌলাজি) বাহিনীর অত্যাচারকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ "ন্যাটো কিংবা সি,এস,ই'এর মত সংস্থাগুলো চুপচাপ যুদ্ধের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছে [পিটার হাজী রিষ্টিক (বেলগ্রেড), ও বেঞ্জামিন কোহেল (লণ্ডন)—ভোরের কাগজ : ২৬-৮-৯২] সবচাইতে হতাশা এবং পরিতাপের বিষয় মধ্যপ্রাচ্যের রাজাগজারা মুসলিম উম্মাহ্‌র এই দুদিনে "মুসলমানরা ভাই ভাই" এই আদর্শ ভুলে হাঁ করে এই দৃশ্য দেখছে, টু শব্দটি করার সাহসও কারো নেই। মধ্যপ্রাচ্যের আরব নিধনে ইসরাঈলী রমরমা তস্করবৃত্তি চললেও এতে শক্তিমানদের সুখনিদ্রায় কোন ব্যাঘাত ঘটছে না।

কারো মধ্যে সামান্যতম বিবেকবোধ থাকলেও তিনি এই অবিচার এবং স্বার্থপরতার রাজত্বের অবসান চাইবেন। কোথায় এর সমাধান? চাতুরি এবং স্বার্থপরতার দিক দিয়ে বর্তমান দুনিয়ার শক্তিমানরা ইতিহাসে অতি নিকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছে। অথচ চৌদ্দশ' বছর আগে অসীম প্রেম ও ভালবাসা নিয়ে আরবের বর্বর মানুষদের মধ্যে যে মহাপুরুষের (সাঃ) আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁর (সাঃ) সরলতা ও বিশাল হৃদয় আজ অব্দি বিশ্ব ইতিহাসে এক তাক লাগানো বিস্ময় হয়ে রয়েছে। তিনি যুদ্ধে ধৃত বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়ে দেয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উপায় খুঁজে বার করতেন। যে মহিলার (হযরত বিবি হালিমা) দুধ তিনি পান করেছিলেন শুধু মাত্র তাঁর গোত্রের সদস্য হওয়ার কারণেই সেই গোত্রের যুদ্ধ বন্দীদের তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন। অনক্ষর মানুষকে অক্ষরজ্ঞান দেয়ার বদলে তিনি যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিতেন। তাঁর (সাঃ) অনুসারীরা আত্মরক্ষার্থে যখন যুদ্ধযাত্রায় বাধ্য হতেন তখন তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি না করা, গবাদি পশু হত্যা না করা, নির্বিচারে অত্যাচার না করা, এমন কি যেখান থেকে আযানের ধ্বনি আসে সেখানে আক্রমণ না করা। তিনি (সাঃ) বলেছেন, "কখনো খেয়ানত করো না, কখনো চুক্তি ভেঙ্গো না। পুরাতন যুগের অসভ্য লোকদের মত শত্রুদের মৃতদেহের কোন অঙ্গচ্ছেদ করো না। এবং কখনোই শিশুদের ও নারীদের হত্যা করো না।' (মুসলিম)

মদীনার ইহুদী এবং নাজরানের খৃষ্টানদের মত ভিন্নধর্মী এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা তিনি দিয়েছিলেন। মুসলমানদের মসজিদে খৃষ্টানদের উপাসনার এবং হৃদ্যতাবজায় শান্তির স্বার্থে আপাত দৃষ্টিতে অবমাননাজনক বলে প্রতীয়মান শর্তে সন্ধি স্থাপনের উদাহরণ তিনিই

(সাঃ) সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি মানুষের উপর মানুষের মেকি আধিপত্য খতম করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "নিশ্চই যারা আমার বান্দা তাদের ওপর তোমার কোন আধিপত্য চলবে না এবং তোমার প্রভু অভিভাবক হিসেবে যথেষ্ট (সূরা বনী ইসরাঈল : ৬৬)। এই শিক্ষা দেখে অভিভূত হয়ে বিশ্বখ্যাত রুশ সাহিত্যিক কাউন্ট লিও নিকোলায়েভিচ টলষ্টয় "Wisdom of Holy Prophet" পুস্তকের ভূমিকায় উল্লেখ করেন, "মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন একজন মহান ঐশী সংস্কারক যিনি অজ্ঞ মানুষকে মূর্তি পূজো এবং অন্যান্য খারাপ কাজে নিমজ্জিত থাকতে বারণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র এক খোদার উপাসনা করতে বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে মানবজাতির মুক্তি ও ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শে উজ্জীবিত করেন। তিনি রক্তপাত ও ধ্বংসকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি এই জগতে মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে নির্ধারিত হয়ে আসেন। একজন মানুষের পক্ষে অর্জনক্ষম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে মহান প্রতিভাটি তিনিই ছিলেন।"

এই মহানবীর (সাঃ) শিক্ষা এবং আদর্শ একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ যুগের শঠ ধুরন্ধর লোভী শক্তিমানদের হাতে মানব জাতি এক মুহূর্তের জন্যও নিরাপদ নয়। এরা মানুষের কান্নার শব্দে পৃথিবীকে ভারী করে তুলেছে। এরা মানুষকে উন্মাদ বানিয়ে ছেড়েছে। তারা রুটির পাহাড় নিয়ে দরিদ্রদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। এদের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে আল্লাহ্‌র ওয়াদা (সূরা তওবা, ৩৩ আয়াত, সূরা নূর ৫৬ আয়াত) এবং রসূলের (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হারিয়ে যাওয়া খেলাফতকে সাংগঠনিকভাবে আঁকড়ে ধরে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় অভিযানে শরীক হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। এ যুগের এই সমস্যার সাহারাকে সমাধানের বন্যানী দিয়ে ভরে তুলতে পারে শুধুমাত্র সেই চিরঞ্জীব নেতার (সাঃ) মহান আদর্শ।

কাদিয়ানের সালানা জলসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) এবারকার কাদিয়ানের সালানা জলসা ২৬-২৮ ফাতাহ্‌ ১৩৭১ হিঃ শাঃ (ডিসেম্বর, ১৯৯২) তারিখ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী দিয়েছেন। আল্লাহ্‌-তা'লা সব দিক থেকে ইহাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আহ্‌বাবে কেরাম এই মহান জলসায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিন। আল্লাহ্‌ তা'লা বন্ধুগণকে আগের চাইতেও কাদিয়ানের সালানা জলসা ৯২তে বেশী বেশী যোগদান করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

নাযের দাওয়াত ও তবলীগ, কাদিয়ান

তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় সপ্তাহ পালন করুন

আগামী ৩১শে অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বছর শেষ হতে যাচ্ছে। স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা যাচ্ছে যেন তারা অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় সপ্তাহ পালন করে চাঁদা আদায়ে তৎপর হন যাতে নিজ নিজ জামাতের মেম্বারগণের তাহরীকে জাদীদের ওয়াদাকৃত চাঁদা পুরোপুরি এ সময়ে আদায় হয়ে যায়। চাঁদা আদায়ের শেষে পূর্ণ আদায়কারীদের একটি তালিকা যেন খাকসারের নিকট পাঠানো হয় যাতে তাদের নাম দোয়ার জন্য হুযূর (আইঃ) খেদমতে যথা সময়ে পেশ করা যায়।

মীর মোহাম্মদ আলী

সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ

নারীর মর্যাদা—সেকাল ও একাল

মিসেস রওশন আরা হক

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। পুরুষ ও নারী এ সমাজের সদস্য ও সদস্যা। উভয়ের সংমিশ্রণে সমাজ গঠিত হয়েছে। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা সমাজ উন্নয়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

মানব প্রকৃতিতে মনুষত্ব ও পশুত্ব (Nationality or animality) যুক্ত রয়েছে,—এ দু'টোর লড়াইয়ে পশুত্ব পর্যুদস্ত হলে মনুষত্ব হয় বিজয়ী;—আর মানবতাবোধ সৃষ্টি হয় মানব মনে। মানুষ পরিণত হয় পূর্ণাঙ্গ মানবে। মহান স্রষ্টা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে (নরনারী) স্বাধীন চিন্তা, চেতনা ও বিবেকের অধিকারী করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। সেহেতু তারা কর্মফলের কথা ভেবে স্ব স্ব জীবন ক্ষেত্রে হবে যত্নবান ও তৎপর। সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে সমাজের সদস্য সদস্যার অবদান অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। নর নারী যে কেউ হোক না কেন দান সবার ক্ষেত্রেই দান; মুল্যায়ন সবার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। স্রষ্টা নারীর ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য না রাখলেও সমাজ কিন্তু নারীকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছে।

প্রাচীন কালে দেখা যায় সমাজে নারী জাতির প্রতি কোন সম্মান তো ছিলই না, বরং তারা হোত নিগৃহীত, নির্যাতিত, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যে, উপেক্ষায় অবহেলায়, অনাদরে নিপীড়নে তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠতো। নারীরা ছিল অজ্ঞাত এবং সাধারণ আসবাব পত্রের শামিল। আর তা ছিল সমাজ-স্বীকৃত।

কন্যা শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করতে এতটুকু ইতস্তত: করা হোত না। শিশু কন্যাটির প্রতি কোন মমত্ব বা দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারতো না তার জন্ম-দাতারাও। তৎকালীন সমাজ এক অমানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রেখেছে। এক আদিম বর্বরতা সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

যেখানে নারী পুরুষ উভয়ের সংমিশ্রণেই সমাজ সেখানে পরস্পরের প্রতি অপরিসীম দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ তো থাকতেই হবে। সৃষ্টির আদি থেকে দেখা যায় নারীরা সর্বদাই সহযোগিতা করেছে, প্রেরণা যুগিয়েছে। জগতে যা কিছু বৃহৎ বা মহৎ সৃষ্টি তার মাঝে নারীর দান তুলনাহীন। যেহেতু সমাজের অধিকাংশ নারী সেহেতু 'অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর': অথচ বাস্তবতায় দেখা যায় উল্টো ঘটতে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা নারীকে ন্যূনতম মর্যাদা দান করতে চাইতো না পুরুষেরা। পুরুষ শক্তির প্রচণ্ডতায় বলীয়ান হয়ে স্বার্থপরতার শীর্ষে আরোহণ করে নারীর অমর্যাদা করেছে যত্রতত্র। তাদের দৃষ্টিতেও নারী হীনমন্যতার শিকার, অবমূল্যায়নের খাতায় লিপিবদ্ধ একটি নাম মাত্র।

পাশ্চাত্যে নারীরা আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বাধীন ও সুখী মনে হলেও তারাও নির্যাতিত হচ্ছে নানাভাবে এ কথা বিভিন্ন সাময়িকী ও পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। এর কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হোল। আমেরিকায় ১৯৮৯ সালে ৯৪,৫০৪ জন নারী ধর্ষিতা হয়, ৯০এ-এ ধর্ষিতার সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আর এক জরিপে জানা গেছে ১৯৮৫ সালে ১৩৫০ জনের বেশী মহিলা তাদের স্বামী, প্রাক্তন স্বামী বা বয়ফ্রেণ্ডের হাতে খুন হয়েছে। এর বাইরেও লাখো মেয়েরা স্বামী বা বয়ফ্রেণ্ডের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে। এত শিক্ষা দীক্ষা সত্ত্বেও এই বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও বহু স্বামী বিশ্বাস করে যে, স্ত্রীকে পিটিয়ে অপমানিত করে তবেই বশে রাখা যায়। স্ত্রীকে একজন মানুষ হিসাবে দেখতে শেখে নি তারা। সব পুঁজি-বাদী সমাজে কম বেশী নারীদের অবস্থান একই। ('নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব'—ইয়াকুব আলী মোল্লা, আজকের কাগজ ২২শে : বৈশাখ, ১৩৯৯)। ভারতে নারীরা কি অবস্থায় রয়েছে তার চিত্রও তুলে ধরছি। ভারতের কাপুরে আপন তিন বোন গলায় ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। তাদের বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু বিয়ে হয় নি। কারণ উপযুক্ত যৌতুক দিয়ে কন্যাদের বর সংগ্রহ করার সঙ্গতি ছিল না বাবা মার (সংবাদ : ৩ই ফাল্গুন, ১৩৯৪) দুঃখে ও অপমানে তিন বোন একযোগে আত্মহত্যা করে দায়ভারগ্রস্থ বাবা মাকে চিরমুক্ত করে দিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ঘটনা বিহারে মুঙ্গের জেলায় লাখো ভগত নামক এক দরিদ্র কৃষক তার তিন অবিবাহিতা কন্যাকে কুপিয়ে হত্যা করার পর তাদের মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতে রাখে। বিয়ের যৌতুকের দাবী মিটাতে না পেরে সে এই কাজ করেছে (সংবাদ : ১৪-৮-৮৭)। ১৯৮৭ সালে প্রথম ছয় মাসে রাজধানীতে ৪২২ জন তরুণী বধুর মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে তিনশ' জন মারা গেছে অগ্নিদগ্ধ হয়ে, অন্যরা বিভিন্নভাবে আত্মহত্যা করে।

এবারে বাংলাদেশের দিকে তাকাই। গত ৮ই মার্চ ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। মহিলা সমিতি, মহিলা পরিষদ এই দিনটি সভা ও মিছিলের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। পত্র পত্রিকায় এ সব সভা এবং মিছিলের খবর সচিত্র প্রকাশিত হয়েছে : ঠিক এর পাশাপাশি বিভৎস পাশবিক হত্যাকাণ্ডের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। (১) ৯ই মার্চ তিন বছরের হালিমা পৈশাচিক অত্যাচারের ফলে মারা যায়। (২) ২০শে মার্চ টঙ্গীর পাপার এলাকার কিশোরী রাফিজাকে ধর্ষণ করে হাত পা বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারা হয় (৩) ২০শে মার্চ মহাখালী হাসপাতালের কর্মচারী গৌরীকে ঐ একই হাস-পাতালের ড্রাইভার সকলের সামনে থেকে জোর করে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে (সংবাদ : ১৭ই চৈত্র, ১৩৯৮)। তার আর্ত চীৎকার শুনে হাসপাতালের কর্মচারীরা যে জবানবন্দী দিয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যেন একটি হিংস্র নেকড়ে বাঘ একটি মেষশাবককে ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে আস্তে আস্তে চিবিয়ে খেল, মানুষ দেখলো কিন্তু ভয়ে তাকে উদ্ধার করতে কেউ সাহস পায় নি। (আজকের কাগজ : ২২শে বৈশাখ, ১৩৯৯, ইয়াকুব আলী মোল্লার নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব)।

এই সব ঘটনার প্রেক্ষাপটে আমাদের যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়, তাতে করে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পরি যে, সনাতনী অমানবিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, ক্ষতযুক্ত সমাজ দেহের নিরাময় ব্যতিরেকে নারী জাতিকে মানুষ হিসাবে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা কখনও সম্ভব নয়। অবশ্য মানব সভ্যতার বৈপ্লবিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে নারী জীবনে সকল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে নানারূপে বাঁধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই পুরুষ শাসিত সমাজে কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকের মূল্যায়ন করা হয় পুরুষ শ্রমিক থেকে ভিন্নতর দৃষ্টিতে। শিক্ষিত পেশা জীবী মহিলার ঘরের বাইরে আপন কর্মক্ষেত্রেও তার নিরাপত্তার অভাবের কথাটি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না কারণ মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানির সংবাদ পত্রিকার নিত্য দিনের সংবাদ বললে ভুল বলা হবে না। অথচ এই নারী একাধারে মা, বোন ও কন্যা হিসেবে সমাদৃত।

বার বার নারী জাতি সোচ্চার হয় অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনের দাবীতে। নারী কল্যাণ সমিতি, মহিলা সমিতিগুলি গঠিত হয় নারী জাতির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে দেশে দেশে তাদের সীমিত অধিকার ও নানারূপ সীমাবদ্ধতার প্রতিবাদে শোভা যাত্রা, মিছিল, মিটিং ও সমাবেশের মাধ্যমে নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে তারা সমাজে পূর্ণাঙ্গ মানুষের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়।

ইউরোপ আমেরিকাতে পর্যন্ত নারীর অধিকার এখনও সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নয়। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করেছেন, মাত্র এই শতকের গোড়ার দিকে। (দৈনিক ইত্তেফাক: ১১ই বৈশাখ, ১৩৯১)। বর্তমানে অবশ্য প্রায় সব দেশের সংবিধানেই রয়েছে নারী অধিকারের অধ্যাদেশ। তবুও দৈনন্দিন জীবনে তাদের দুর্গতির অন্ত নেই।

কঠিন বাস্তবতা তাকে জানিয়ে দিচ্ছে—তার গতিপথ কোথায় আর কোথায়ই বা তার ঠিকানা।

দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান।
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সম্মান।

নারী ঘরে বাইরে সর্বত্রই তার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে—অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আজকের নারী সমাজ ভাবতে শিখেছে তাদের কিছু করণীয় আছে। এরই ফলশ্রুতিতে কিছু সংখ্যক নারী সমাজ জনকল্যাণকর ও গঠনমূলক কাজে সম্পৃক্ত রয়েছে।

সেকালে ও একালে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। অতীতে সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ সুলতানা শাসক হিসেবে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা পুরাকালের শাসকের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনা খাওলা যে শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোন বীর সেনানীর বীরত্বের সমতুল্য বলেই বিবেচিত হয়।

দেশে বিদেশে বেশ কিছু সংখ্যক নারী, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাত হয়ে আছেন। এক সময় বিশ্ব শান্তি পরিষদের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন মাদাম বেলা ব্লুম। মাদাম কুরি দু'বার নোবেল পুরস্কার অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। শান্তির জন্য মাদাম টেরেসা একজন নোবেল বিজয়ণী। রণক্ষেত্রে মুমূর্ষু সেনানীর সেবা করে গেছেন অকাতরে সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। আমাদের সমাজে অন্ধত্ব একটি অভিশাপ বিশেষ। সেই অন্ধত্বের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে হেলেন কেলারের ব্যবস্থাও ছিল অনন্য। নারী জগৎ থেকে আরও কিছু নারীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টকারী কূটনীতিবিদ মার্গারেট থেচার একজন নারী। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মহিলাদেরও চিন্তাবিদ রাজনীতিবিদ সমাজসেবী হওয়া সম্ভব।

এতে প্রমাণ হয় উপযুক্ত সুযোগ অনুকূল পরিবেশ ও সামাজিক সহযোগিতা পেলে নারী জাতি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদা সম্পন্না হতে পারেন। কোন গৃহে জননী সুশিক্ষিতা হলে গোটা পরিবেশটাই সুশিক্ষিত হওয়ার আশাবাদী হয়। মায়ের হাত দিয়েই সৃষ্টি হতে পারে মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দেশবরেণ্য নেতা বা রাষ্ট্র প্রধান। "যে হাত দোলনা দোলায় সে হাতই দেশ শাসন করে।" আগামীর পূজনীয় নাগরিক শিশুটি—জননীর আত্ম ত্যাগের দ্বারাই তৈরী হয়।

যে জননীরা সন্তান গড়ার দায়িত্বে নিয়োজিত তারাও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার অভাবে আশঙ্কিত। তাদের উপরেও চলছে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার। নিজেদের সবল স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীরা স্বামী-সন্তানের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় নিযুক্ত রয়েছে। এর পরেও প্রতিনিয়তই তারা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের দুর্ব্যবহার এমন চরমে ওঠে যে, স্ত্রীরা এক পর্যায়ে নির্যাতন নিপীড়ন সইতে না পেরে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়।

যৌতুকের ন্যায় একটি আইন বিরোধী প্রথার দ্বারা স্ত্রীরা যেমন নির্যাতিত হয়ে আসছে তেমনি পুরুষদের উপরে নির্ভরশীলতার কারণে সামান্য একটু বিচ্যুতিতেও তাদের উপরে চলছে কঠোর নির্যাতন। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশের আইন ক্রমে কঠোরতর হচ্ছে বটে; কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে চিন্তা চেতনার সমৃদ্ধতার যখন তুঙ্গে; তখন যৌতুকের মত নিষ্ঠুর কুপ্রথা থেকে নারীরা মুক্ত হতে পারে নি। আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলোও নীরবে নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে।

কবির ভাষায় বলতে গেলে, "প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।" এ সব কারণেই বিশ্ব নারী দিবসের অন্যতম আওয়াজ ছিল, 'কিসের ঘর, কিসের বর, ঘর যদি হয় মারধোর'। কতখানি তিক্ততায় মনসিক্ত হলে মহিলাদের আওয়াজ এই ধরণের হতে পারে বা হওয়া সম্ভব।

নারী জাতির অবস্থা কি এরূপ অবহেলিতই থাকবে? এর কি কোনই প্রতিকারের পথ নেই! এমন সময় ছিল যখন ইসলামের আগমনের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছিল নারী মুক্তি;—নারী জাতি তার অবজ্ঞাত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছিল; পেয়েছিল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকল সুযোগ সুবিধা সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা। সারা বিশ্বের কোন জাতি বা কোন ধর্ম নারীর ভাগ্য উন্নয়নে যা করতে সক্ষম হয়নি তাই ইসলাম নারী জাতির জন্য করতে পেরেছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম নারী অন্য যে কোন ধর্মের নারীর চেয়ে অধিকতর সম্মানের অধিকারিণী। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির মালিকানা ও অন্যান্য যাবতীয় অধিকার সম্পর্ক, আইন ও নিয়মাবলী ঐশী বিধানে বিধৃত আছে।

ইসলামের পবিত্র কেতাব সমগ্র মানবজাতির জীবন বিধান। তৎকালীন সমাজে যে সব সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়েছিল তার সমাধানের সকল ব্যবস্থাই এতে রয়েছে। ইসলাম নারীকে কোন ভাবেই হেয় করে নি। স্ত্রী স্বামীর কাছে উপেক্ষণীয় হলে বা স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে অসম্মতি থাকলে সে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। বিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে দেয় সম্পদ স্বামী ফিরিয়ে নিতে পারে না। আবার বিধবারাও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন।

ইসলাম একটি উদার নীতিমালার ধর্ম। যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। মহান আল্লাহ্ পাক নারী পুরুষের কোনই বৈষম্য করেন নি। নর ও নারী একই তুলাদণ্ডে বিচার্য। পাপ পুণ্যের হিসেবে কোন ভিন্নতা করেন নি—উভয়ের কর্মফল অনুযায়ী যে যার শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করবে। নারী হবার কারণে ভিন্ন রকমের ফল ভোগ করবে না।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন শরীফে বলেছেন, "ওয়ালা হুন্না মিসলুল্লাযী আলায়হিন্না" অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের পুরুষদের উপরে অধিকার আছে যেমন পুরুষদের আছে নারীদের উপর। (সূরা বাকারা: ২২৯)।

ইসলামে সম্পদে নারীর অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। "পুরুষদের জন্য উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতা মাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, এবং নারীদের জন্যও উহাতে অংশ আছে যাহা পিতা মাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, অল্প হইলেও অথবা বেশী হইলেও উহা হইতে একটি নির্ধারিত অংশ।" (সূরা নিসা: ৮ আয়াত)

ইসলামে সামাজিক ক্ষেত্রেও যেমন নারীর অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পাপ পুণ্যের বিচারে নারী পুরুষ উভয়ের সমতা রক্ষা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন, "অতএব তাদের প্রভু তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, তোমাদের মধ্য হতে কোন কর্মীর কর্মকে সে পুরুষ হোক বা নারী আমি নষ্ট করবো না। (সূরা আলে ইমরান, ১৯৬ আয়াত) ইসলামে মায়ের প্রতি সন্তানের আচরণ সম্পর্কিত বিষয়াবলী ঐশী বিধানে বিধৃত আছে। সন্তান যেন মাতা পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করে। তাদের উপর সন্তানের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। সন্তানের জীবিতাবস্থায় মাতা পিতা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের প্রতি আহ! শব্দটিও যেন উচ্চারিত না হয়।

হযরত রসূল করীম (সাঃ)ও মেয়েদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে তিনি ঘোষণা করলেন কন্যা সন্তানও সন্তান। সে পুত্র সন্তানের পাশাপাশি লালিত পালিত হবে। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কারও তিনটি, দুইটি বা একটি কন্যা সন্তানও থাকে এবং সে যদি তাদেরকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারে তবে সেই ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতবাসী হবে" (বোখারী শরীফ)

তিনি এও বলেছেন, আমার নিকট থেকে নারীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তিনি স্ত্রীদের সাথে আচরণ সম্পর্কে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর প্রতি আচরণে উত্তম।" (তিরমিযী)

মায়েদের প্রতি উৎকৃষ্ট আচরণ প্রদর্শনের জন্য সন্তানদেরকে অত্যধিক তাগিদ দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে—"কোন এক মজলিসে রসূল করীম (সাঃ)-কে একটি প্রশ্ন করা হয়—"কাকে সবচেয়ে বেশী সম্মান করতে হবে"। তিনবার একই প্রশ্ন করা হয়। তিনি (সাঃ) বার বার একটিই মাত্র জবাব দিয়েছিলেন—মাকে। এর পরেও যখন তাঁকে (সাঃ) প্রশ্ন করা হয়, 'তার পর' কে? তখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন, 'তোমার পিতাকে'। অর্থাৎ মায়ের স্থান উর্ধ্বে।

অন্য আরও একটি হাদীসে এসেছে, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত। এতে এটাই বুঝা যায়, সন্তানের কাছে মায়ের স্থান শীর্ষে। সর্বাগ্রে মায়ের শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথা চিন্তা করতে হবে। তাঁর ত্যাগ, মমতা ও সেবা তুলনাহীন। হৃদয় নিংড়ানো মায়া ও মমত্বের বাঁধনে জননী ও সন্তান আবদ্ধ। প্রয়োজনে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে সন্তানের কল্যাণ কামনায় সকাতর দোয়ায় মশগুল হয়ে থাকেন জননী; যেখানে স্রষ্টার আশিস নেমে আসে তার দোয়ার কবুলিয়তের পথে। প্রতিটি পুরুষ কোন না কোন মায়েরই সন্তান তাই জাতিগতভাবে পুরুষ জাতি নারী জাতির প্রতি মাতৃজাতি হিসেবে শ্রদ্ধাবনত

থাকবে। প্রতিটি—পুরুষের কর্তব্য হবে প্রতিটি নারী তথা সমগ্র মাতৃজাতির প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা। মায়ের শিক্ষাই সন্তানের উভয় জগতের সফলতার চাবিকাঠি।

নারী জাতির অধিকার সম্পর্কে যুগ-ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন—"ইসলাম যেরূপ নারীর অধিকার সংরক্ষণ করেছে অন্য কোন ধর্ম সেরূপ করে নাই। কুরআনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, 'ওয়ালা হুন্না মিসলুল্লাযী আলায় হিন্না বিল মারুফে (২:২২৯)। পুরুষদের উপর স্ত্রীলোকদের অধিকার আছে যেমন পুরুষদের আছে নারীদের উপর। আমি শুনেছি যে, কোন কোন লোক তাদের (স্ত্রীলোকদের) নিজেদের জুতার সমতুল্য মনে করে এবং তাদের দ্বারা খুবই নোংরা কাজ করায়। তারা তাদের গালি-গালাজ করে এবং তাদের খুবই হেয় চক্ষে দেখে, তারা তাদের পর্দার নির্দেশাবলী এরূপ বিধি বহির্ভূতভাবে চাপায় যা তাদের চার দেয়ালের মধ্যে মধ্যে বন্দী রাখার তুল্য।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন সম্পর্ক হবে যেন তারা পরস্পর প্রকৃত বিশ্বস্ত বন্ধু.....যদি পুরুষেরা তাদের সংগে সুন্দর ব্যবহার না করে, তবে তারা আল্লাহ্‌র সংগে কিভাবে সুস-সম্পর্ক বজায় রাখবে। (মলফুযাত)।

তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি ভাল ব্যবহার করে না, সে আমার জামা'ত-ভুক্ত নহে, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা সম্পর্কে যুগ-ইমাম হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতামাতার সম্মান করে না, এবং সাধারণ বিষয়ে যা কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জগতে আল্লাহ্‌র অনেক প্রিয় বান্দা অমর হয়ে আছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হলো।

হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (রহঃ) মাতৃ আদেশ পালনের ঘটনাটি যুগ যুগ ধরে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

আবার হযরত বায়েযিদ বোস্তামীর (রহঃ) ঘটনাও উল্লেখযোগ্য: একদিন বায়েযিদ বোস্তামীর (রহঃ) অসুস্থ মাতা গভীর রাতে উঠে ছেলের কাছে পানি খেতে চাইলেন। তিনি পানি নিয়ে এসে দেখেন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। সারারাত তিনি পানির পাত্র হাতে মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সকাল না হওয়া পর্যন্ত মা'র ঘুম ভাঙ্গে নি। ঘুম ভাঙ্গার পর মা দেখলেন ছেলে পানির পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে। তাকে মা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কখন আপনি জেগে উঠে পানি খোঁজ করেন, তখন যদি দেখেন আমি ঘুমিয়ে আছি আর আপনি পানি পান করতে পারবেন না। এ জন্যেই আমি দাঁড়িয়ে আছি।' মা সন্তানের জন্য গভীরভাবে দোয়া করেন।

বিশ্ব আদালতের সাবেক বিচারপতি ও পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লা খান সাহেবও একজন মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন, যিনি মায়ের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মা'র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ছিলেন অটল ও অবিচল। পুণ্যবতী মায়ের জীবনের প্রভাব তার জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে বহুলাংশে। যাঁরা মাকে মর্যাদা দেন আল্লাহ্‌ তা'লাও তাদেরকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রেই উন্নতি দেন ও সম্মানিত করেন।

উল্লেখিত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানে নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে পুরুষের আপন স্বার্থের কারণে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিই নারীর মর্যাদা ক্ষুন্ন করে চলেছে নির্দিধায়। পাশ্চাত্য জাতি সভ্যতার ধারক বাহক বলে দাবী করলেও নারীকে সেখানে ভোগ্য বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও আল্লাহ্‌ রসূলের (সাঃ) আদেশ অমান্য করে নারী জাতির মর্যাদাকে করা হচ্ছে খর্ব ও ভূলুণ্ঠিত। পাক-বাংলাদেশ-ভারত-উপমহাদেশে নারীরা হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে যৌতুকের শিকার। রাষ্ট্র সমাজ ও ধর্মীয় আইন নারীর মর্যাদা দানে উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সেসব আইনের বিধানকে অস্বীকার করে চলেছে।

কিন্তু কেন ব্যর্থতা—এর একমাত্র কারণ মানুষের আত্মশুদ্ধির অভাব। আত্মা পরিশুদ্ধ না হলে সমাজ পরিশুদ্ধ হতে পারে না। এই পরিশুদ্ধতা কিভাবে আসা সম্ভব? এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্যে খোদা-ভীতির সৃষ্টি হয়। এই খোদা-ভীতি মানুষের মনে তখন সৃষ্টি হয় যখন মানুষ ঐশী বিধানের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজের জীবনে তা প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়। এই সক্ষমতা নিজের চেষ্টা ও আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। ঐশী সাহায্যের সাথে ঐশী বাণী প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সম্পৃক্ত।

জগতে মানুষের মাঝে যখন খোদা-ভীতির অভাব ঘটে, ঐশী বিধানের যখন অবমাননা হয় এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি কর্তব্যের প্রতি অবহেলা ভীষণভাবে প্রসারিত হয়, তখন আসমান যমীনের মহান মালিক রাব্বুল আলামিন নীরব থাকতে পারেন না। তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন "ইন্না নাহনু নায্‌যালনায্‌ যেকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফেযুন" (সূরা হিজর: ১০)— নিশ্চয়ই আমরাই এ যেকের (উপদেশ মালা কুরআন) নাযেল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী। তাই কুরআনের শিক্ষাকে মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের প্রেরণ করেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহযোগিতায় জাতি ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করেন। এটাই আল্লাহ্‌র বিধান বা চিরাচরিত নিয়ম, যা কখনও ভংগ হয় না বা ভংগ হবার নয়। আল্লাহ্‌ এ সম্পর্কে বলেছেন, ওয়ালা

তাজেদা লে সুন্নাতেনা তাহ্‌ভিলা, আর তুমি আমাদের নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

আল্লাহ্‌তা'লার এই চিরাচরিত বিধান অনুযায়ী বর্তমান যামানাতেও এ রকম একজন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আগমনের অবশ্যই প্রয়োজন। কেননা বর্তমানে নারী জাতি যেমন নির্যাতিত, নিগৃহীত হচ্ছে তেমনি মানব সমাজও বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম উশৃংখলার মধ্য দিয়ে চলছে। ধর্মহীনতার ও অমানবিকতার অন্ধকার সারা বিশ্বকেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। যার ফলে মানুষ অবক্ষয়ের অতলগহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। এরূপ নৈরাশ্যজনক ধর্মীয় ও সামাজিক চরম অবক্ষয়ের সময়েই আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের আগমন ঘটে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহ্‌র সেই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আগমন ঘটেছে। তিনি বর্তমান যমানার যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)। তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে নারী জাতির মুক্তির পথ। তাঁর ছায়াতলে সমবেত না হওয়া পর্যন্ত মানবজাতি আল্লাহ্‌র সাহায্য ও করুণা লাভে বঞ্চিত থাকবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, যুগ-ইমামকে না মেনে মারা গেলে জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে। বর্তমান যুগের যুগ-ইমামকে না মানার কারণেই মানব জাতি ক্রমেই নৈতিক অধঃপতনের নিম্নস্তরের দিকে নেমে যাচ্ছে। নারী তার ন্যায্য পাওনার পরিবর্তে পাচ্ছে নির্যাতন, উপেক্ষা ও বঞ্চনা। মুসলিম সমাজেও এই জাতীয় হীন কার্যকলাপ ব্যাপকাকারে অহরহই সংঘটিত হচ্ছে; যা আমাদের জন্য সুখকর বা সম্মানজনক নয়। কেননা, ইসলামে নারীর সম্মান সম্ভ্রম ও অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, যা কুরআন সুন্নাহ ও হাদীস যুগ যুগ ধরে সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। আমরা ঐসব ধর্মীয় শিক্ষাকে পিঠের পিছনে ফেলে রেখেছি। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-ব্যাপৃত আহমদীয়া জামা'তের সদস্যগণের ব্যবহারিক জীবনে ইসলাম পুনরায় ইহার অতীত গৌরব ও সৌরভ সহ নবজীবন লাভ করছে। কুর-আন হাদীস ও সুন্নাহর অনুসরণে জীবন যাপন করার আদর্শ নমুনা এই জামা'তের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই জামা'তের মধ্যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল-কামিতার যে উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় এবং যে ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত প্রত্যেকটি সদস্যের মাধ্যমে প্রকটিত হয়ে উঠে, তাতে আশা করা যায়, খোদার অসীম কৃপায়, তারা ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর রূপায়নকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সাথে সাথে ইসলামী ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার ফলে, সকল বৈষম্য দূরীভূত হবে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এসে মানব জীবনকে আশীর্বাদে ভরে দিবে। সে দিন বেশী দূরে নয়। আমরা সে দিনের অপেক্ষায় আছি।

ইসলামে সহনশীলতা

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

ইসলাম আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীত ধর্ম। ইহা কোন দেশ বা জাতি কিংবা দল বা কোন এলাকায় সীমাবদ্ধ নহে। ইহা এমনই এক ধর্ম যা সাদা, কালো, উচ্চ, নীচ, বর্ণ-বৈষম্য ইত্যাদি সকল প্রকার ভেদাভেদের মূলউৎপাটন করতঃ বিশ্বের সকল জাতির সকল বর্ণের সকল মানুষকে একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। মহান সৃষ্টি কর্তা একই আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনা দ্বারা জগতে শান্তি সুখের আবাসস্থল গড়ে তোলাই ইসলামের উদ্দেশ্য। বিশ্বে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টি। প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুই নিজস্ব নিয়ম মেনে চলছে। সেই নিয়মকে জেনে নিয়ে কাজ করাই হলো প্রতিটি মানুষের কাজ। আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টিতে মানুষের স্থান সর্ব উচ্চে। মানুষকে ভয় দেখিয়ে অত্যাচার-যুলুম-নির্যাতন করা চলে না। ইসলামের নীতি কারো পক্ষ হয়ে কথা বলে না। কোন জাতি-বর্ণ-দেশ-সম্প্রদায় বা দলের পার্থক্য না করে সবাইকে এক মহব্বতের অটুট বাঁধনে আবদ্ধ করতঃ সবার প্রতি ন্যায় বিচার দ্বারা মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার নিপীড়ন দূর করা ইসলামের মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত। মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করা ইসলামে এবাদতের মধ্যে শামিল। পাক কালামে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "এবং মানুষ প্রথমে একই জাতি ছিল, তারা বিভক্ত হয়ে যায়।" (সূরা ইউনুস, ২ রুকু) "আদিতে সকল মানুষ এক জাতিভুক্ত ছিল, অতঃপর আল্লাহ্‌ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে নবীগণকে প্রেরণ করেন, এবং তাদের সাথে সঠিকভাবে কিতাবও নাযিল করেন, যাতে লোকে যে বিষয়ে বিবাদ করছিল, সেই বিষয়ে তারা তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের মীমাংসা করতে পারে। (সূরা বাকারা, ২৬ রুকু)

পূর্ববর্তী নবীগণও তাঁদের প্রতি প্রেরিত ঐশী গ্রন্থসমূহকে শ্রদ্ধা এবং বিভিন্ন ধর্মমতের অনুগামীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "এবং বল আল্লাহ্‌তা'লা যত ঐশীগ্রন্থ প্রেরণ করেছেন, তার সবগুলিতেই আমি বিশ্বাস রাখি, আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সব কিছু মীমাংসার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহ্‌-তা'লা তোমাদের প্রতিপালক এবং আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের কর্মফল রয়েছে, তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদের কর্মফল, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে পুনরায় একত্রিত করবেন এবং তাঁর নিকটই সকলে প্রত্যাবর্তন করব।" (সূরা শূরা, ২ রুকু) "এবং তোমরা কিতাবী লোকদের সঙ্গে সদুদ্দেশ্য ব্যতিরেকে এবং যারা (তোমাদের সঙ্গে) অন্যায় ব্যবহার করেছে, তাদের সঙ্গে ব্যতিরেকে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ো না; তাদেরকে বল, আমাদের ও তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে, তৎসমুদয়েই আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের খোদা ও তোমাদের খোদা একই এবং

তাঁরই উদ্দেশ্যে আমরা আত্মনিবেদিত।" (সূরা আনকবূত, ৫ রুকূ) অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতার উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "এবং যদি তারা তোমার সাথে ঝগড়া করে, তবে তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসরণকারীগণও আত্মসমর্পণ করেছে। কিতাবীদের এবং অজ্ঞ লোকদের বল, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করবে? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে তারা নিশ্চয়ই পথ পাবে। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে তোমার কর্তব্য শুধু সুসংবাদ ঘোষণা করা এবং জানিয়ে দেয়া আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর দৃষ্টি রাখেন।" (আলে-ইমরান) "প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আমরা তাদের অনুসরণের জন্য ঐশী নির্দেশ প্রেরণ করেছি; সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ ব্যাপারে তর্কে প্রবৃত্ত না হয়; তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর; তুমি অবশ্যই সঠিক পথ প্রাপ্ত; কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, বলে দাও; তোমরা যা করছ তা খোদাই সর্বোত্তম জানেন।" (সূরা হজ্জ) "কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরায়, তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রকাশ্যরূপে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়া।" (সূরা নাহল)

"তুমি বল, আল্লাহ্‌কে মেনে চল এবং রসূলকেও মান। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরাও, তবে তার দায়িত্ব তার প্রতি যেভাবে দেয়া হয়েছে তার এবং তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের প্রতি যেভাবে দেওয়া হয়েছে তার। যদি তোমরা তাকে মেনে চল তবেই তোমরা সুপথ পাবে। রসূলের কর্তব্য শুধু স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে সত্য পৌঁছে দেয়া।" (সূরা নূর) আর যদি মোশরেকগণের কেহ তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দাও যেন সে খোদার বাণী শ্রবণ করতে পারে, তারপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। (সূরা তওবা) তুমি মোমেনদেরকে বল, যারা আল্লাহ্‌র দীনের আশা রাখে না, তাদের কাছ থেকে যেন প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, তারা ক্ষমা করে দেয়, যেন তিনি এক জাতিকে (ঈমানদারগণকে) তাদের মহৎ কাজের পুরস্কার দিতে পারেন।" সূরা (জাসিয়া) "ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই"। (বাকারা) বল প্রয়োগে ধর্মান্তর সাধনকে নিম্নোক্ত আয়াতে কঠোর ভাষায় ঘৃণা করা হয়েছে। "যদি তোমার প্রতিপালক চাইতেন, পৃথিবীতে যত লোক আছে সকলে এক সঙ্গে ঈমান আনয়ন করতো। এরপরও কি তুমি ঈমান আনতে মানুষকে বাধ্য করতে পার? খোদার অনুমতি ব্যতীত কেউ ঈমান আনয়ন করতে পারে না।" (সূরা ইউনুস)

জগতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তেই ইসলামের অনুসারীগণকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ জাতি। তারা সৎ কাজে আদেশ দিবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। ইসলাম যুক্তি প্রমাণের ধর্ম। ইসলামই পৃথিবীতে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছে। যুক্তি ও প্রমাণই যথেষ্ট। কোন ক্রমেই কারো মতাদর্শের উপর বল-প্রয়োগ করা চলবে না। ইসলামে অসত্য ও কল্পনার কোন স্থান নেই। ব্যক্তির কাছে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ইসলাম তার বাণী পেশ করে। মানব মনের উপরেই ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলামে

যুদ্ধ আছে কিন্তু তা আক্রমণাত্মক নহে, কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে, ধর্মস্থানের পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে। কোন ধর্মের লোককে জোর করে মুসলমান বানানো অথবা তাদের উপাসনালয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ইসলামে নেই। মুসলমান হবে বিশ্বাসে এবং কাজে। বল প্রয়োগ বা জোর-যুলুমের উপর বিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে না। রিপুর দাস না হয়ে ন্যায় বিচার করতে বলা হয়েছে পবিত্র কুরআন করীমে। শ্রেণীগত দলগত পার্থক্য না রেখে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত রসূল (সাঃ) বলেছেন, "মানুষ সকলেই এক আদমের সন্তান, আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।" আল্লাহ্‌র সকল প্রাণী নিয়ে তাঁর পরিবার, তিনিই আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় যিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টপ্রাণী-গণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন।" "আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি যে দয়ালু আল্লাহ্‌ তার প্রতি দয়ালু, তাই ভাল কি মন্দ, সকল মানুষের প্রতি সদয় হবে।" "খাঁটি মুসলিম সে-ই যার বাসনা ও হস্ত থেকে অন্যরা নিরাপদ।"

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। ইসলাম প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন আল্লাহ্‌র রহমতরূপে। ইস-লামের শিক্ষা এত উদার, মহৎ এবং উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণের মন প্রাণ এই মহৎ শিক্ষার প্রতি কতটুক আকৃষ্ট হয়েছে বা এই মহান আদর্শ শিক্ষাকে জানার এবং বুঝার আগ্রহ থেকে তারা কেনই বা বঞ্চিত; এ জন্য দায়ী কে বা কারা? এক কথায় ইহার সহজ উত্তর এই যে, আল্লাহ্‌ তা'লা যাদের উপর ইহার দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছিলেন, তাদের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম ব্যর্থতাই এর জন্য দায়ী। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায় যে, যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'লা কঠোর বাণী উচ্চারণ করতঃ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত; আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মরো না; আর তোমরা সকলে মিলে একত্রে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ কর (সাবধান) দলে দলে বিভক্ত হয়ো না, এবং স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের মনে মহব্বতের সৃষ্টি করে দিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা সকলে ভাই ভাই হয়ে গেলে।" (আলে-ইমরান) আল্লাহ্‌ তা'লার উপরোক্ত নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে দুনিয়া-দারীর লোভ লালসার মোহে একই মুসলমান জাতি নানান দলে বিভিক্ত হয়ে আজ তেহাত্তর ভাগে পরিণত। এই তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েও তারা ক্ষান্ত হয়নি, এক দেশ আরেক দেশের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে যুক্তি প্রমাণকে তাদের হৃদয় থেকে দূরে নিক্ষেপ করতঃ হাতে তুলে নিয়েছে 'কুফরী' নামক শানিত কৃপাণ। একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে কুফরীর তীক্ষ্ণ তরবারিতে কাটছাট করেও নিরস্ত্র হয়নি। শক্তি বল প্রয়োগে পরস্পর পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে মত্ত হয়ে দ্বন্দ্ব কলহ ঝগড়া মারামারিতে হয়েছে মশগুল।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ এক-অদ্বিতীয় এবং তিনি একতাই পসন্দ করেন।" "যে ব্যক্তি তার অনিষ্টকারীকে ক্ষমতার মধ্যে পেয়েও ক্ষমা করছে আল্লাহ্‌র কাছে সে সম্মানিত।" অহঙ্কারী ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না, উগ্রভাষীও নয়।" "তোমরা কাউকে কাফের বলো না, যদি সে প্রকৃতপক্ষে কাফের না হয় তবে নিজেই কাফের হয়ে যাবে।" "তোমরা সকলে মিলে পরস্পর ভাই ভাই, কখনও একে অন্যকে অত্যাচার করবে না, পরস্পরকে ঘৃণা করবে না। ন্যায়ের আসন হৃদয়ে। কাজেই যার হৃদয় ন্যায়পরায়ণ সে অপর মুসলমানকে ঘৃণা করে না, এবং এক মুসলিমের যা কিছু আছে, তার রক্ত, সম্পত্তি ও সুনাম তা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।"

কথা, কাজ, আচার ও ব্যবহারে সর্বদা পূর্ণতম সহনশীলতা প্রদর্শনই মহানবী হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মহান বাণী। ব্যক্তিগত দলগত বা শ্রেণীগত বিদ্বেষ ছড়িয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতঃ হিংসা পরায়ণতা বা নৃশংসতা প্রদর্শনের অবকাশ ইসলামে নেই। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মহান বাণীকে দূরে নিক্ষেপ করে, ব্যক্তিগত, দলগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মানবীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় একতা ও ভ্রাতৃত্বকে বিদায় দিয়ে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অসহনশীলতা ও গোঁড়ামীর যে তাণ্ডব খেলা লক্ষ্য করা যায়, অমুসলিমগণ এই সমস্ত তাণ্ডব খেলাকে কি ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিবে অথবা ঘৃণার চক্ষে দেখবে? যারা ছিল একজন আরেক জনের ভাই, তারাই হয়েছে একজন আরেক জনের শত্রুতে পরিণত। ইসলামকে যেখানে নিজেদের মতলব হাসিলের জন্য ব্যবহার করা হয়, ইসলামের শিক্ষার সাথে তার কোন সম্বন্ধ নেই। ব্যক্তিগত জীবনে যারা সৎ, সাধু এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী তারা কখন নীতিহীন কাজে লিপ্ত হতে পারে না। হয় তো বা কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, কেন তারা কি কুরআন হাদীস পাঠ করে নাই? নিশ্চয় করে: হয়তো বা আপনি শুনতে পান সন্ধ্যা থেকে নিয়ে সকাল পর্যন্ত মাইক যোগে সারা রাত্রি ভর কুরআন পাঠের আওয়াজ অহরহ। কিন্তু যিনি পাঠ করেছেন তিনি নিজেও হয় তো বা জানেন না যে, কি পাঠ করছেন। এই কুরআন পাকে আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে কি আদেশ দিয়ে ছিলেন। এবং তার কতটুকুই বা পালন করেছি আমরা। মনে পড়ে গেল হযরত যিয়াদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর একটি পবিত্র বাণী। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "এলেম" উঠে যাবে। প্রশ্ন করা হলো ইয়া রসূলুল্লাহ! 'এলেম' কি প্রকারে উঠে যেতে পারে? যেহেতু আমরা কুরআন পাঠ করছি, অতঃপর আমাদের সন্তানগণ ইহা পাঠ করবে। এমনিভাবে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে। উত্তরে হুযুর (সাঃ) বল্লেন, হে যিয়াদ! তোমাকে তো আমি এই শহরের একজন জ্ঞানী লোক মনে করতাম; ইহুদী ও খৃষ্টানগণ কি তৌরাত ও ইঞ্জিল কেতাব পাঠ করছে না, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করে না।" হুযুর (সাঃ) আরও বলেছেন, "তারা কুরআন পাঠ

করবে কিন্তু তাদের গলার নীচে প্রবেশ লাভ করবে না। হৃদয়ঙ্গম না করাটা যে এলেম উঠে যাওয়া হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর উপরোক্ত পবিত্র বাণী থেকে স্পষ্টই তা প্রমাণিত হলো অর্থাৎ কুরআন পাঠ করবে কিন্তু ইহার ভিতরে কি আছে বা নেই, একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখবে না।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আমার প্রবন্ধের ইতি টানতে চাচ্ছি। শুনেছি 'কুলহু আল্লাহ্‌'র সূরা তিনবার পাঠ করলে নাকি সমুদয় কুরআন পাঠের সওয়াব পাওয়া যায় কিন্তু কেন যে এই সূরার এত মরতবা একটি বারের তরেও ইহাকে নিয়ে একটু চিন্তা গবেষণা করে দেখা হয় কি যে, এই সূরায় আল্লাহ্‌তা'লা একেশ্বরবাদীগণের উপর কি আদেশ দিয়েছিলেন এবং তার কতটুকুই বা পালন করা হয়েছে? একেশ্বরবাদী মুসলমান জাতির উপর দায়িত্ব ছিল যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে শেরেক বেদাতকে উচ্ছেদ করতঃ জগতে আল্লাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যারা বলে আল্লাহ্‌ এক পুত্র গ্রহণ করেছে, খোদা একজন খোদা, খোদার পুত্র যীশু এক জন খোদা, মরিয়ম এক জন খোদা তিন জনে এক জন, এক জনে তিন জন তিনে এক একে তিন অর্থাৎ খোদা একজন নহে তিন জন, সেই ত্রিত্ববাদী-গণের মোকাবেলায় একেশ্বরবাদী মুসলমান জাতির উপর আল্লাহতা'লার নির্দেশ ছিল যে, "বল, আল্লাহ্‌ এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই। তিনি সর্ব শক্তি-মান, অভাবহীন। তাঁর কোন পুত্র নাই। তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই, না তিনি কারো সন্তান। আর তাঁর সমকক্ষ কেহ নাই।" (সূরা এখলাস) আজ, কে বা কারা আল্লাহতা'লার উপরোক্ত নির্দেশকে মাথায় নিয়ে, খোদা একজন নয় তিনজন, খোদা এক পুত্র গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি শেরক বেদাতকে জগতের বুক থেকে চিরতরে মুছে দিয়ে সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার কাজে নিমগ্ন? ঈমান ও আমল খাঁটি মুস-লমান হওয়ার লক্ষণ। ঈমান না থাকলে আমলের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি আমল না থাকলেও ঈমান হয় অর্থহীন। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ মত আমল বা কাজ করতে হয়। আল্লাহ্‌তা'লার একত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করে স্নেহ, দয়া, সহানুভূতি, পরোপকার, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি গুণাবলীর অনুশীলনের দ্বারা পার্থিব জীবনে দুনিয়ার সকল মানুষ পরস্পর ভাইয়ের ন্যায় সুখে শান্তিতে বাস করুক ইহাই ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশ।

আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়াবী লোভ লালসার মোহে মত্ত হয়ে ব্যক্তিগত, দলগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতঃ কথায়-কাজে, আচার-ব্যবহারে, স্বভাব-চরিত্রে এবং অন্যান্য কল্প-কাহিনী দ্বারা ইসলামের মহান আদর্শকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে যারা আত্ম তৃপ্তী লাভ করছে এবং বিশ্বা-সের দিক দিয়ে অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও প্রমাণহীন ভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে

(অবশিষ্টাংশ ৫৪ পাতায় দেখুন)

ওয়াকেফীনে নও শিশুদের অভিভাবকদের জন্য অবশ্য করণীয় বিষয়াবলী ঃ

[সম্প্রতি ওকালতে ওয়াকফে নও, তাহরীকে জাদীদ থেকে ওয়াকেফীনে নও শিশুদের অভিভাবকদেয় জন্যে একটি পাঠ্যসূচী পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান।]

পিতামাতার নিছক মৌখিক নির্দেশের মূল্য খুবই সামান্য যদি না তাদের ব্যবহারিক জীবনে তাদের কথার সাথে কর্মের সঙ্গতি থাকে। কেননা শিশুরা অভিভাবকের শক্তিশালী ও উত্তম গুণাবলীর চেয়ে দুর্বলতাগুলোকে সাথে সাথেই গ্রহণ করে থাকে। [হুযুর (আইঃ)-এর বক্তব্য থেকে]

ওয়াকেফীনে নও শিশুদের অভিভাবকদের জন্যে অবশ্য করণীয় বিষয়গুলি হল ঃ

ভোর রাত্রে উঠুন আর তাহাজ্জুদ নামায পড়ার চেষ্টা করুন।

যথাসময়ে পিতার বা-জামাত নামায পড়া উচিৎ এবং মাতারও গৃহে যথাসময়ে নামায পড়া উচিত। প্রত্যেক দিন উচ্চ স্বরে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করুন।

শিশুকে স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন রাখুন। আর যদি সে ধূলি ময়লা মাখে, সাথে সাথে পরিষ্কার করুন। শিশুকে কখনও উলঙ্গ রাখবেন না। তাকে আবহাওয়া অনুযায়ী পোষাক পরিধান করান।

শিশুকে বেশী বেশী গাঢ় আলিঙ্গন, চুমু খাওয়া এবং জড়িয়ে ধরা থেকে বিরত থাকুন. কেননা ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।

মায়ের উচিৎ তিনি যেন দু'বছর ধরে শিশুকে স্তনের দুধ পান করান যদি কোন কারণ বশতঃ চিকিৎসকের বারণ না থাকে।

নির্ধারিত বিরতির সাথে শিশুকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাবার খাওয়ান। এতে নিয়ম-নিষ্ঠ হউন। আর তাদের মধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিয়ম-নিষ্ঠার গুণ প্রবিষ্ট করুন।

শিশুকে যথা সময়ে টিকা-ইন্‌জেকশন দিন এবং ওয়াকেফে নও সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

শিশুর সাথে ভদ্রভাবে ও সম্মানের সাথে কথা বলুন। আর তার সাথে খারাপ ব্যবহার ও কটু বাক্য থেকে বিরত থাকুন।

তাকে ভীতিপ্রদ গল্প শুনাবেন না। পুণ্যবান ও সাহসী লোকদের সম্বন্ধে তাদের নিকট গল্প করুন।

দোয়ার জন্যে মাসে কমপক্ষে রীতিমত একটি চিঠি হুযূর (আইঃ)-এর নিকট লিখুন।

শিশুকে যথারীতি শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলো পাঠ করুন:

(১) কামিয়াবী কি রাহেঁ (২) মিনহাজুত্‌তালেবীন (৩) আল্লাহ্‌ কি বাতেঁ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বাচ্চোঁ কি পরবারিশ (৫) ওয়াকেফীনে নও (পিতামাতার পথ-নির্দেশের জন্যে) (৬) কোঁপাল (৭) ঘুঁচা (৮) গুল।

শিশুকে বলুন যে, সে ওয়াকফে নও-এর একজন সৈনিক। আর সে একজন উত্তম খোদা-ভীরু শিশু।

শিশুকে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষ পত্র নিজের কাছে রাখার অনুমতি দিন এবং অন্যকে কিছু দেয়ার জন্যে উৎসাহিত করুন। ইহা তাকে সদকা-খয়রাত করতে প্রেরণা যোগাবে এবং নিজের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রদের সাহায্য করার গুণের বিকাশ ঘটাবে।

তাকে একা একা খেলতে দেয়ার পরিবর্তে আপনাদের উপস্থিতিতে খেলা ধূলা করার অভ্যেস তার মধ্যে সৃষ্টি করুন।

শিশুর জন্যে রীতিমত দোয়া করতে থাকুন বিশেষ করে নিম্নলিখিত দোয়া:

রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা ওয়া যুর্‌রিয়াতেনা কুর্‌রাতা আইওনেন ওয়াজ্‌আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা। [হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান করো আর আমাদেরকে খোদা-ভীরুগণের ইমাম (নেতা) বানাও]

সার কথা: আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি শক্তিশালী ওয়াকেফীনের দল গঠন করুন এবং যথাযথ গুণাবলীতে সুসজ্জিত করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করুন।

টিকা: স্মরণ রাখুন, কোন এক মাসে যা শিখাতে হবে তা যেন ঐ মাসেই শিখান হয়। আরও অধিক শিখতে কোন বাধা নেই। নিশ্চিত থাকুন যে, সে যা শিখছে তা যেন সে ধরে রাখে। মনে রাখার জন্যে তাকে শিখতে দিন ভুলে যাবার জন্যে নয়।

এক থেকে দু'বছরের শিশুদের জন্যে ঃ

যুগপৎভাবে পিতামাতাকেও নিম্নোক্ত ৪টি বিষয়ে অনুশীলন করা উচিত :

(১) কোন কিছু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' [আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়]।

(২) অবস্থানুযায়ী নিম্নোক্ত দোয়া উচ্চ স্বরে পাঠ করুন :

খাবার শুরু করার আগে—বিসমিল্লাহে ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ্‌ [আল্লাহ্‌র নামে (খাবার খাচ্ছি) আর তাঁর কল্যাণ কামনা করছি]।

খাবার শেষ করে :

আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়াজআলনা মিনাল মুসলেমীন (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন আর আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।

(৩) যখনই হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করা হয়, উচ্চ স্বরে বলুন : সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ্‌ তাঁর উপর আশিস ও শান্তি বর্ষণ করুন)।

(৪) ভদ্রভাবে উপদেশের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি করুন যাতে তাকে কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে বলা হলে সে যেন তাথেকে বিরত থাকে।

দু'বছর থেকে তিন বছরের শিশুদের জন্যে ঃ

জানুয়ারী ঃ যখনই শিশু কোন কাজ শুরু করে সে যেন বলে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

ফেব্রুয়ারী ঃ শিশু যখন কারও সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তার নিম্নবর্ণিত কথা দ্বারা অভিবাদন জানানো উচিৎ : আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর কল্যাণসমূহও)।

বালকদের দুই হাতে হ্যাণ্ডশেক (মোসাফাহা) করা উচিৎ। আর পিঠ চাপড়ানোর আদর পাবার জন্যে বালিকাদের অপেক্ষা করা উচিৎ।

মার্চ্চ ঃ খাবার শেষ করে বা কোন কিছু খাওয়ার পর শিশুদের আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র) বলা উচিৎ।

এপ্রিল ঃ যদি শিশুকে কোন কিছু দেয়া হয় সে যেন বলে : জাযাকুমুল্লাহ্‌ (আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দিন)।

মে ঃ কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে সে যেন বলে, আসতাগফিরুল্লাহ্‌ (আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনাকারী)।

জুন ঃ শিশুকে ভালভাবে বুঝান যে, আল্লাহ্‌ তা'লা সমগ্র জগতকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর সেও যেন ওয়াকফে নও-এর একজন অতন্দ্র সিপাহী এবং সকলের সেবায় নিয়োজিত একজন উত্তম ও সদাচারী শিশু।

জুলাই ঃ শিশুকে ডান হাতে জিনিষপত্র দেয়া এবং নেয়ার অভ্যেস সৃষ্টি করান। আর বাম হাত নাক ঝাড়া ও শৌচকর্মের মত কাজে ব্যবহার করতে শিখান।

আগষ্ট ঃ তাকে কতগুলো জিনিষের মালিক করে দিন আর তাকে তথেকে অন্যদেরকে দান করার জন্যে উপদেশ দিতে থাকুন।

সেপ্টেম্বর ঃ শিশুদেরকে ঐসব খেলনা দিন যা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিগুলোকে সমৃদ্ধ করে।

অক্টোবর ঃ শিক্ষা দিন যে, আমাদের প্রিয় ও ঐশী শিক্ষক হলেন পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

নভেম্বর ঃ তাদেরকে এই কলেমা তাইয়্যেবা শিক্ষা দিন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। (আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল বা প্রেরিত পুরুষ)।

ডিসেম্বর ঃ আমাদের খলীফা হুযুরের নাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। বর্তমানে তিনি লণ্ডন শহরে অবস্থান করছেন। (চলবে)

আতফাল সম্মেলন—৯২

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার চতুর্থ কেন্দ্রীয় বার্ষিক আতফাল সম্মেলন ৯২ ইং আগামী ৯ই অক্টোবর '৯২ রোজ শুক্রবার (ইজতেমার তৃতীয় দিন) ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে জাঁক জমকের সহিত অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, ইনশাআল্লাহ্‌। এই জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি:

১। সম্মেলনে আগত আতফালরা অবশ্যই নাযেম আতফাল বা তার প্রতিনিধির নেতৃত্বে যোগদান করবেন। তাই আতফালদের তালিকা সত্বর অত্র অফিসে প্রেরণ করতে হবে যেন তাদের প্রত্যেকের নামে কার্ড ইস্যু ও নির্দিষ্ট বিশেষ তোহফা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে রাখা যায়।

২। এ বৎসরও তিনটি মজলিসকে শ্রেষ্ঠ মজলিস ঘোষণা ও পুরস্কৃত করা হবে, তাই সত্বর আপনার মজলিসের বার্ষিক কার্যাবলীর পূর্ণ রিপোর্ট অত্র অফিসে প্রেরণ করুন।

৩। তিনজন শ্রেষ্ঠ আতফালকেও পুরস্কৃত করা হবে, তাই আপনার মজলিসের এক বা একাধিক আতফালের আখলাক, মজলিস তৎপরতা, লেখাপড়ায় কৃতিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট ও সত্বর প্রেরণ করুন।

৪। আগামী বৎসরের তাজনীদ ও বাজেট তৈরী করে সাথে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি।

৫। আগামী কার্য বৎসরের জন্য আতফালুল আহমদীয়ার প্রস্তাবিত আমেলার তালিকা অবশ্যই সংগে নিয়ে আসার অনুরোধ করছি।

মহান আল্লাহতা'লা আমাদেরকে তাঁর পবিত্র সিলসিলার প্রত্যেক কর্মসূচীকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করার তৌফীক দানে ধন্য করুন, আমীন।

আতফাল দিবস

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর তালীম তরবিয়তী বিষয়ে জামাতের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণের প্রেক্ষিতে এবং বাংলাদেশের তালীম ও তরবীয়তের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী আগামী ৯ই অক্টোবর' ১৯৯২ রোজ শুক্রবারকে ''আতফাল দিবস'' ঘোষণা করেছেন। তিনি আতফালের তালীম ও তরবীয়তি অবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশের গৃহীত পরিকল্পনার সাথে একমতা প্রকাশ করেন ও সম্মানিত অভিভাবকগণকে এই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী দৃষ্টি প্রদান করার আহ্বান জানান। ঐ দিন ৪ নং বকশী বাজার রোডস্থ ''দারুত তবলীগে'' মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর চতুর্থ কেন্দ্রীয় বার্ষিক আতফাল সম্মেলন '৯২ ও বার্ষিক মাতাপিতা দিবস ৯২ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দিবসটির সকল প্রোগ্রামকে বাস্তবায়ন করার জন্য মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব অভিভাবকবৃন্দ ও আতফালুল আহমদীয়ার সাথে সংশ্লিষ্টদের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন ও সকলকে এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া জারী রাখার অনুরোধ করেছেন।

মোহাম্মদ সেলিম খান
মোহ্ তামিম আতফাল
বাংলাদেশ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া

(৪৯ পৃঃ পর ইসলামে সহনশীলতা প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ)

চতুর্থ আসমানে জিঁয়িয়ে রেখে যারা ত্রিত্ববাদীগণের সাথে হাত মিলিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করছে, ইসলামের মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেহেশ্তে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে তারাই হলো ইসলাম দরদী। আর যারা পবিত্র কুরআন হাদীস ও বাইবেলের অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তিন খোদার পূজারীগণের খোদা যীশুকে [ঈসা (আঃ)-কে] মৃত সাব্যস্ত করতঃ কাশ্মীরে তাঁর কবর বিদ্যমান প্রমাণিত করে ক্রুশ মতবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে যাদের মোকাবিলায় ত্রিত্ববাদীগণ আজ লবণের মত গলে যাচ্ছে, আজ যারা কিনা জগতের বুক থেকে শেরক বেদাতকে উচ্ছেদ করে আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত ধর্ম ইসলামের একত্ববাদকে প্রচার ও প্রসার কল্পে নিজেদের ধন, জন এবং জীবন উৎসর্গ করে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে মানুষের সেবায় স্কুল কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, মসজিদ এবং ইসলামের প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতঃ দৈনিক পাঁচবার আল্লাহু আকবর নিনাদে ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রভূমি প্রকম্পিত করে তুলছে, যাদের কথা, কাজ, প্রচার ব্যবহার স্বভাব চরিত্রের এবং ইসলামের মহান সৌন্দর্য শিক্ষা প্রচারের প্রভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে তিন খোদার পূজারীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করতঃ নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করছে, সেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই কিনা ইসলামের দুশমন! প্রার্থনা করি সত্যকে বুঝার জন্য আল্লাহ্ তা'লা সকলের হৃদয়ে দ্বার উন্মুক্ত করে দিন। আমীন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ

মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের অনেকগুলো দিক আছে। সবদিকে আলোকপাত করা সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসম্ভব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে পরিচালিত করার জন্য এই প্রবন্ধে দৈনন্দিন জীবনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। তিনি যদিও খুব সাধারণ কাপড় পরিধান করতেন এমনকি জোড়াতালি দেয়া কাপড়ও ব্যবহার করতেন তথাপি সেগুলো পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হতো। দাঁত পরিষ্কার রাখার বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। মিসওয়াক বা গাছের ডাল দিয়ে দাঁত নিয়মিত মাজা তাঁর সুন্নত। বর্তমান যুগে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করার মাধ্যমেও আমরা এই সুন্নত পালন করতে পারি। তিনি (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা দুধ পান কর তারপরে তোমরা অবশ্যই কুলি করবে। হুযুর (সাঃ) দাঁত মাজার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলেছেন, যদি বিষয়টি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট সাধ্য না হতো তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক ওয়াক্তে নামাযের পূর্বে দাঁত মাজার আদেশ দিতাম। হুযুর (সাঃ) দাঁতের পরিচ্ছন্নতার উপর এত গুরুত্ব দিতেন যে, তাঁর অন্তিম সময়ে যখন জ্বরের প্রকোপে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন, মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে তাঁর দাঁত মিসওয়াক করে দিতে ইঙ্গিত করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজের মুখে চিবিয়ে চিবিয়ে 'মিসওয়াক' নরম করে সেটি দিয়ে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দাঁত মিসওয়াক করে দিয়েছিলেন। প্রতি জুমুআয় অন্ততঃ একবার ভালভাবে গোসল করার উপরে তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এছাড়াও প্রাকৃতিক কারণে গোসল এবং ওযুতো রয়েছেই। হুযুর (সাঃ) বলেছেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের শর্ত। আবার বলেছেন: তোমরা নিয়মিত কাপড় ধুবে, চুল ছাঁটবে, দাঁত মাজবে, নিজেরা পরিপাটি ও পরিষ্কার থাকবে (ইবনে আসাকীর)। হুযুর (সাঃ)-এর এই সুন্নত আমাদেরকে একদিকে একথা বুঝাচ্ছে যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা আমাদের চারিত্রিক অভ্যেসে পরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয়, অপরদিকে এটিও জানাচ্ছে যে, আধ্যাত্মিক ও আন্তরিক পবিত্রতার জন্য বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক।

হুযুরে পাক (সাঃ) কারও ব্যক্তিগত Privacy র উপর অন্যদেরকে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটি বৃত্ত আছে যেটি তার একান্ত নিজস্ব। সেটিতে বিনা অনুমতিতে হস্তক্ষেপ করা ঘোর অপরাধ বলে সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত হয়। মহানবী (সাঃ) একবার একজনকে একটি বাড়ীর অভ্যন্তরে বিনা অনুমতিতে উঁকি মারার কারণে বলেছিলেন, আমার ইচ্ছে হয় তোমার চোখ দুটি উত্তপ্ত লোহার শিক দিয়ে উপড়ে ফেলি। রহমাতুল্ লিল আলামীন (সাঃ)-এর মুখে এমন কঠোর কথা সত্যিই ব্যতিক্রম ধর্মী। এর দ্বারা এটি অতি স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, মানুষের ব্যক্তিগত Privacy র উপর তিনি কত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি (সাঃ) আরও বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের বয়স দশ বছর হয়ে গেলে তাদেরকে পৃথক পৃথক বিছানায় শোয়াবে। মা বাবার কক্ষে বিশেষ কয়েকটি সময়ে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা ইসলামী দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আমাদের সমাজে এই রীতি প্রচলন করা একান্তভাবে আবশ্যক।

রহমাতুল্ লিল্ আলামীন (সাঃ)-এর জীবনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি অতি সাদাসিদা জীবন যাপন করতেন। কোন ধরণের আনুষ্ঠানিকতায় জড়িয়ে পড়া তাঁর নীতি ছিল না। একবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বোন হযরত উম্মে হানি (রাঃ)-এর বাসায় আসেন। বলেন, তোমার কাছে খাবার কি আছে? হযরত উম্মে হানি বলেন যে, আপনার সামনে দেয়ার মত কিছুই নেই। হুযুর (সাঃ) বলেন, বাড়ীতে কি কিছুই নেই? তখন উম্মে হানি (রাঃ) বলেন যে, কেবল সিরকা আছে আর কয়েক টুকরা শুকনো রুটি আছে। হুযুর বলেন, তাই নিয়ে এসো। হুযুর (সাঃ) সিরকায় রুটি ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে লাগলেন আর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকলেন। খাবার শেষে তিনি বারবার বলছিলেন, সিরকা কি চমৎকার ঝোল, সিরকা কি চমৎকার ঝোল! আমাদের সমাজে বেশীর ভাগ লোক দরিদ্র। তাদের জন্য হুযুর (সাঃ)-এর এই নীতিটি বিশেষ উপকারী। Simple living and high thinking (সরল জীবন যাপন ও ধ্যান-ধারণা) আমাদের জীবনের motto (উদ্দেশ্য) হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিনা কারণে আনুষ্ঠানিকতা ও আয়োজন আমাদের জন্য এক অর্থের অপচয় বাড়ায়; সরল জীবন যাপন সহজ খাওয়া দাওয়া দারিদ্র মোচনের অন্যতম পথ।

আঁ-হুযুর (সাঃ)-এর জীবনের বহু দিকের মধ্যে মাত্র কয়েকটি উপরে তুলে ধরা হলো। এ কয়টির প্রতি যদি আমরা বিশেষ করে আমাদের সন্তানদের শৈশব কাল থেকে অনুশীলন করি তাহলে পরিণত বয়সে এগুলো আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে অনেক সহায়তা হতে পারে।

একটি তাজা নিদর্শন

আলহাজ্জ আহমদ সেলবর্সী

মূলতঃ সিলেটের অধিবাসী। নাম আবদুল্লাহ। পিতার নাম সাঈদ। তাই তিনি নাম লিখেন আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী। ইদানিং তিনি নামের সংগে আল্ আজহারী লকবটিও লাগিয়েছেন। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা নয়, শুধু দর্শন করে তিনি এই পদবীটি নিজের নামের সংগে যুক্ত করেছেন।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আগামী পত্রিকায় তিনি আহমদী জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে যা কলমে আসে তাই লিখে যাচ্ছেন। তার মিথ্যা অপবাদগুলি খণ্ডন করে তাকে মিথ্যা বেসাতি না করার জন্য বারবার উপদেশ দেওয়া হলেও তিনি চোখ বন্ধ করে অনর্গল মিথ্যা ছড়িয়ে যাচ্ছেন। মৌলানা আকরাম খানের নামে মিথ্যা চটকদার গল্প রচনা করেছেন, যে গল্প আকরাম খান সাহেব লিখে যান নি সেই গল্প তিনি তৈরী করে আগামীতে ছেপেছেন।

আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতাকে আল্লাহ্ জানিয়ে ছিলেন,—ইন্নি মুহিনুম মান আরাদা ইহানাতাকা ওয়া ইন্নি মুয়ীনুম মান আরাদা ইয়ানাতাকা (তাযকেরা) যে তোমাকে অপমান বা অপদস্থ করবে আমি তাকে অপমানিত ও অপদস্থ করব। কত সত্য এই প্রতিশ্রুতি! শত বৎসরেরও বেশী সময় থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে আসছে বার বার। জালালাবাদীর জন্যও এর ব্যতিক্রম হল না। ৩০/৮/৯২, ১/৯/৯২, ২/৯/৯২ তারিখের আজকের কাগজে এই জালালাবাদীর ক্রিয়া, কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি প্রকাশিত হল। সমগ্র বাংলাদেশে প্রচারিত হল তার অপকর্ম এবং চরিত্রের কথা। জালালাবাদী আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে লিখেছেন একটি সাপ্তাহিকে। আর তার অপকর্মের খতিয়ান ছেপেছে একটি বহুল পঠিত দৈনিকে। যেসব বিষয়ে তিনি অহংকার করেছিলেন তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে প্রকাশিত তথ্যে। জালালাবাদী সাহেব যদি এথেকে ফায়দা হাসিল করেন তাহলে তিনি আল্লাহ্ তা'লাকে তৌবা, কবুলকারী রূপেই দেখতে পাবেন। আর যদি হঠকারিতা দেখিয়ে মিথ্যাকে পরিত্যাগ না করেন তাহলে প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। ফাতা'বেরু ইয়া উলিল আবসার।

অনিবার্য কারণ বশতঃ পাক্ষিক আহমদীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা বর্ধিত কলেবরে একত্রে বের করতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত—পাক্ষিক আহমদী কার্যস্থাপনা।

সংবাদ

মজলিসে আমেলার অনুমোদন

আগামী তিন বছরের জন্য হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক অনুমোদিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর মজলিসে আমেলা

১। এডিশনাল ন্যাশনাল আমীর :	জনাব আবদুল বারী
২। নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ম : ও ওয়াকফে নও বিভাগের দায়িত্বে	,, ভিজির আলী
৩। নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২য় : ও পাবলিকেশন বিভাগের দায়িত্বে	,, মকবুল আহমদ খান
৪। নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩য় : ও তালীম-তরবীয়ত বিভাগের দায়িত্বে	,, আহমদ তৌফিক চৌধুরী
৫। জেনারেল সেক্রেটারী :	,, মীর মোবাশ্বের আলী
৬। সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ :	,, নাজীর আহমদ ভুইঁয়া
৭। ,, ফাইনান্স :	,, মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন
৮। এডিশন্যাল সেঃ ফাইনান্স :	,, গিয়াস উদ্দীন আহমদ
৯। সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ	,, মীর মোহাম্মদ আলী
১০। সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ :	,, তাসাদ্দক হোসেন
১১। সেঃ ওসীয়্যত ও অডিও ভিডিও	,, এ, কে, রেজাউল করীম
১২। সেক্রেটারী তবলীগ :	,, মোহাম্মদ আবদুল হাদী
১৩। ,, রিশ্‌তানাতা :	,, এন, এন, মোহাম্মদ সালেক
১৪। ,, উমুরে আমা :	,, এ, টি, এম, হক
১৫। ,, উমুরে খারেজা :	,, নূরুদ্দীন আমজাদ খান
১৬। ,, যিয়াফত :	,, কাসেম আলী খান
১৭। ,, জায়েদাদ :	,, নূরুদ্দীন আহমদ খান
১৮। ,, সানাত ও তেজারত :	,, বশীর উদ্দিন আকবাল আহমদ খান চৌঃ
১৯। ,, জিরাত :	,, ডাঃ আওলাদ হোসেন
২০। ন্যাশনাল অডিটর :	,, শফীউল আলম

সবাই যাতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আমাদের চাঁদা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ১৯৯২-৯৩ সনের বাজেট অনুমোদন করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা দোয়া করব আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ বাজেটে বরকত দিন আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বিগত বছরে আমরা আমাদের বাজেটের ৮৮.৩০% আদায় করতে সক্ষম হয়েছি। সবটুকু পাই নি বলে আমরা আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক অনেক কিছু করতে পারি নি। আমাদের সামনে অনেকগুলো পরিকল্পনা —এগুলো বাস্তবায়নে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরকার।

বিগত ১০ই জুলাই, ৯২ তারিখের খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ দুনিয়ার যে ৪৪টি জামাতের মালী কুরবানীতে অগ্রগতির কথা বলেছেন—তাতে বাংলাদেশকে ১২তম স্থানে উল্লেখ করেছেন। এ খুতবার উপর আমাদের মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বাংলাদেশের আহমদীদের প্রতি আরও আগে বাড়তে আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেককে এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। এখন থেকে প্রত্যেক আহমদীকে অতীতের সকল দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে নিজ নিজ চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। প্রত্যেক মাসে চাঁদা ঠিকভাবে পাওয়া না গেলে পুরো বছরের পরিকল্পনা একটা আর্থিক বছরে সম্পাদন করা যায় না।

এ লাযেমী চাঁদা দিয়ে কতগুলো জরুরী প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই, অবস্থাপন্ন ভাইদের খেদমতে নিম্নোক্ত কতিপয় খাতে সাধ্যানুযায়ী ডোনেশন দেয়ার আবেদন করছি।

১। ক্যাসেট।

এ খাতে ডোনেশন প্রয়োজন। এ থেকে প্রত্যেক মুরব্বীকে হুযুর (আইঃ)-এর খুতবার ক্যাসেট প্রদান করা হবে। ৩৫০টি ক্যাসেট ও একটি উত্তম ক্যাসেট রেকর্ডার ক্রয় বাবদ এ খাতে হুযুর (আইঃ) অনুমোদিত বাজেট ৩০ ০০০/ (ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র। উল্লেখ্য যে, হুযুর (আইঃ) এই খাতে ডোনেশন আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

২। মোটর গাড়ী ও সাইকেল ক্রয়ঃ

বর্তমানে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একটি মাইক্রোবাস রয়েছে। গাড়ীটি হুযুর (আইঃ)-এর অর্থ সাহায্যে কেনা হয়েছে। সময়ের সাথে চলতে হলে নিজস্ব বাহন অতীব জরুরী। এ গাড়ীটি নিয়ে আমরা আমাদের গ্রামের জামা'তগুলো পরিদর্শন করতে পারছি না। বর্তমান অবস্থায় একটি জীপ হলে গ্রামের জামাতগুলোর সাথে যোগাযোগ সহজতর হবে বলে আমরা অনুভব করছি। শর্তযুক্ত খাতে (অর্থাৎ অবস্থাপন্ন সদস্যদের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া সাপেক্ষে), এ খাতে হুযুর (আইঃ) তিন লাখ টাকার বাজেট অনু-

মোদন করেছেন। বন্ধুগণ এখাতে অনুদান দিলে জামা'তগুলোর সাথে ঢাকার দূরত্ব কমবে—অনেক সমস্যাবলীর দ্রুত সমাধান হবে।

তাছাড়া গ্রামের জামা'তগুলোর মোয়াল্লেম সাহেবদের তবলীগি ও অন্যান্য কাজের জন্য সাইকেল জরুরী। আমরা এ অর্থ বছরে (১৯৯২-৯৩) আটটি সাইকেল কিনে মোয়াল্লেম সাহেবদেরকে সরবরাহ করার লক্ষ্যে শর্তযুক্ত বাজেটে কুড়ি হাজার টাকা প্রাপ্তির আশা করছি। বন্ধুগণ এ ব্যাপারে আপনাদের সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করলে এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে।

৩। প্রদর্শনী ঃ

অ-আহমদী ও সুধী সমাজে আমাদের স্থায়ী প্রদর্শনীগুলোর প্রভাব যথেষ্ট বলে তবলীগের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। বর্তমানে ঢাকা সহ তিনটি জামা'তে আমরা স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আরও ক'টি জামা'তে শীঘ্র এ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া যে প্রদর্শনীগুলো এখন বর্তমানে রয়েছে—সেগুলোরও কিছুটা উন্নয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে।

আমাদের চলতি বাজেট থেকে এ কাজ সম্ভব হচ্ছে না বলে আমরা শর্তযুক্ত বাজেটে এ খাতে ত্রিশ হাজার টাকা খরচের পরিকল্পনা নিয়েছি।

বন্ধুগণ এ খাতে অনুদান দিয়ে এ মহান কাজে শরীক হবেন বলে আমরা বিশ্বাস রাখি।

৪। মসজিদ/মিশন কায়েম ঃ

আমাদের মসজিদগুলোর সংস্কার ও কিছু কিছু ছোট ছোট মসজিদ নির্মাণ অতীব জরুরী। তাই, এ খাতে আপনাদের অনুদান জামা'তের কাজে সহযোগী হবে। আমরা সবাইকে এ খাতে অনুদান দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের প্রত্যেকের কিছু কিছু অনুদান একত্রিত হলে—তা দিয়ে বড় বড় মহৎ কাজগুলো অতি সহজে সম্পন্ন করা যাবে—ইনশাল্লাহ।

৫। যাকাত ঃ

যারা 'সাহেবে নেসাব' তারা অবশ্যই তাদের উপর দেয় যাকাত বায়তুল মালে জমা দিয়ে আপনাদের সম্পদকে পরিচ্ছন্ন করবেন। ইসলামে বায়তুল মাল খলীফার নিয়ন্ত্রণাধীন। এ নীতিতে ন্যাশনাল আমীর তাঁর অধিনস্থ Custodian। আপনারা এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা।

যাকাত তহবিল থেকে নিয়মিতভাবে ৭০ (সত্তর)টি অসহায় দুঃস্থ পরিবারকে মাসোহারা দেয়া ছাড়াও আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ গরীব ছাত্রদের শিক্ষার খরচ বহন করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইর হৃদয়কে সম্প্রসারিত করুন, আমীন।

এ, কে, রেজাউল করীম
সেক্রেটারী ফাইনান্স

সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

মারহাবা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ মারহাবা ইয়া নাবীআল্লাহ্

১২ই রবিউল আউয়াল ইসলামের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল দিন। এবার এ দিনে ঢাকা সহ বাংলাদেশের আনাচে কানাচের সকল জামাতে অতি শান-শওকত ও জাঁক জমকের সাথে সীরাতুন্ নবী (সাঃ) দিবস পালিত হয়। এ দিবসের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা। এসব জলসায় আঁ-হুযূর (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। সারা বছর ধরে জামাতে, হালকায় এবং বাড়ীতে বাড়ীতে এ জলসা চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এসব জলসা তখনই সার্থক হবে যখন আমরা সকলে হুযূর (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ নিজেদের জীবনে রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবো।

এ পর্যন্ত যেসব জামাত থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো :

ঢাকা জামাত

১০ই সেপ্টেম্বর, ৯২ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ ঘটিকা হতে এশার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব নাজির আহমদ ভূইয়া, মকবুল আহমদ খান এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ।

লাজনা ইমাইল্লাহ, ঢাকার উদ্যোগেও পরের দিন জুমুআ বাদ দারুত তবলীগ মসজিদে এক সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম জামাত

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, '৯২ রোজ বৃহস্পতিবার চকবাজারস্থ মসজিদ প্রাঙ্গনে যথাযথ ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে ও ইসলামিক ঐতিহ্য অনুসারে সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তারা হলেন সর্বজনাব আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, এস, এ, নিজামী, আরিফুজ্জামান, মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল মুদলে উদ্দিন ও সভাপতি স্থানীয় আমীর নূরুদ্দীন আহমদ।

তাহেরাবাদ জামাত

১১ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ জন বক্তা বক্তব্য রাখেন। অ-আহমদী ভাই সহ উপস্থিতির সংখ্যা ৮৫ জন।

নিউ সোনাতলা জামাত

২৭/৮/৯২ ইং বাদ মাগরেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিউ সোনাতলা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে এক সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব এস, এম, মাহমুদুল হক, আবু সাঈদ (মিলন), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী, জয়নাল আবেদীন, মহসীন আলী, মোয়াল্লেম এস,এম, আবদুল হক এবং সভার সভাপতি জনাব আক্কেল আলী সমাপ্তি ভাষণ দান করেন।

আহ্‌মদনগর জামাত

৮/৯/৯২ইং তারিখ রোজ মংগলবার বাদ আসর দারুল হাশেম মহল্লায় এবং ১০/৯/৯২ ইং তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত আহমদনগর-এর জামে মসজিদ প্রাংগনে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করেন সদর মুরব্বী মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী মাওলানা বশীরুর রহমান এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হাসেম, স্থানীয় মোয়াল্লেম আহসানউল্লা পাটোয়ারী ও অন্যান্য বক্তাগণ।

শাহবাজপুর জামাত

শাহবাজপুর লাজনা ও নাসেরাতের সীরাতুন্‌নবী জলসায় বাড়ীর আশেপাশের গয়ের আহমদী মহিলা সহ ১৯ জন অংশ গ্রহণ করেন।

কুমিল্লা জামাত

গত ১১/৯/৯২ইং তারিখে বাদ জুমুআ সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন সর্বজনাব আবদুর রব, আল-হাজ্জ শামসুল হক, আলী আকবর ভূঞা, গোলাম কাদের (কায়েদ, বিবাড়ীয়া), আবুল হোসেন ভূঞা, জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিছ মিয়া ও প্রেসিডেন্ট ডাঃ আবদুল আযীয।

ক্রোড়া জামাত

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করেন সর্বজনাব নাজির হোসেন ভূইয়া, মইনুল হক ভূইয়া, তৌফিক আহমদ ভূইয়া, শরীফ আহমদ চৌধুরী, আতিকুর রহমান ভূইয়া, মোয়াল্লেম মোহাম্মদ শাহ আলম খান এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ্‌ মুহাম্মদ ভূইয়া।

কটিয়াদী জামাত

১১/৯/৯২ তারিখে রোজ শুক্রবার দিন এক সীরাতুন্‌নবী জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মাষ্টার আবুল খায়ের, আঃ হান্নান, মোঃ খলিল আহমদ, আঃ মান্নান, আঃ আওয়াল, সৈয়দ আনোয়ার আলী, (তেরগাঙী জামাত) মোয়াল্লেম এ,কে, এম, আনসারী। প্রায় শতাধিক লোক উক্ত জলসায় যোগদান করেন।

তারুয়া জামাত

গত ১০/৯/৯২ রোজ বৃহস্পতিবার তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতে মসজিদ বাশারতে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, ডাঃ আহমদ আলী, জহির আহমদ মিয়াজী, জুয়েল আহমদ, ও প্রফেসর আবু শাহেদ। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব শামসুল হাসান সজিব। বিশেষ অতিথি জনাব আজিজ আহমদ সুন্দর এবং উপদেশ

মূলক বক্তব্য রাখেন। জলসায় ৪০০ জন পুরুষ ও মহিলা অংশ গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে ৫০-এর অধিক অআহমদী ভাই-বোন উপস্থিত ছিলেন।

রঘুনাথপুর বাগ্ জামাত

গত ১১/৯/৯২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ রঘুনাথপুর বাগ জামাতে এক সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মনসুর আহমদ (খুলনা), আহমদ তারেক মুবাশ্বের (মোয়াল্লেম), শামসুর রহমান (প্রেসিডেন্ট, খুলনা জামাত)। সভায় ৭/৮ জন অ-আহমদীসহ প্রায় ৩০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাত

১০ই সেপ্টেম্বর, ৯২ ইং রোজ বৃস্পতিবার বিকাল ৪-৩০ মিঃ সময় আহমদী পাড়া নামাযের স্থানে অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি প্রায় ৩০০ জন। এতে প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব শেখ আবদুল আলী এবং শেখ মোস্তাক আহমদ। আলোচনা করেন সর্বজনাব মৌলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ও সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি স্থানীয় আমীর মৌঃ ফারুক আহমদ শাহেদ।

কুকুয়া জামাত

এ জামাতে সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোঃ রুস্তম আলী, কাঞ্চন আলী হাঃ, শাখাওয়াত হোসেন ও রফিক আহমদ।

নারায়ণগঞ্জ জামাত

বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর, '৯২ ইং রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩-৩০ ঘটিকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আবুল কাসেম আনসারী, ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ দান করেন স্থানীয় আমীর হেলাল উদ্দিন আহমদ।

বগুড়া জামাত

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, '৯২ সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আফতাব আহমদ, আলতাফ হোসেন, খন্দকার আজমল হক, এ, কে, এম তাহমিদুল হাসান (জেলা কায়েদ), শরীফ আহমদ খান চৌধুরী ও সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ।

তেবাড়ীয়া জামাত

১১/৯/৯২ বাদ জুমুআ সীরাতুন্ নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ হলেন সর্ব জনাব শরীফ উদ্দিন আহমদ, সেলিম আহমদ, এম, এ, ওয়াহেদ, মাহমুদ আহমদ শরীফ, (মোয়াল্লেম) ফারুক আহমদ, আলহাজ্ব রেজাউল করীম ও সভাপতি আবদুস সালাম।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবন

গত ১০/৯/৯২ ইং রোজ বৃহস্পতিবার 'দারুত তবলীগ' মসজিদে বাদ মাগরিব সীরাতুন্‌নবী (সাঃ)-এর জলসা যথাযথ মর্যাদার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব জিল্লুর রহমান মোড়ল, জি. এম, রইসুজ্জামান, এস, এম শাহীন ইসলাম; শেখ মাহফুজুর রহমান এবং মোয়াল্লেম মজিদুল ইসলাম।

ভাতগাঁও জামাত

গত ১১/৯/৯২ ইং শুক্রবার বাদ জুমুআ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত ভাতগাঁও-এর সীরাতুন্‌নবী (সাঃ)-এর জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব গোলাম আযম, শরীফ আহমদ, ফজলার রহমান, এস, এম, সোহরাওয়ারদী, নূর উদ্দীন আহমদ, ইসমাঈল আহমদ, মোয়াল্লেম মাহমুদ আহমদ আনসারী। উক্ত জলসায় ডোহাওা, বীরগঞ্জ, হেলেঞ্চাকুরী, ক্ষুদ্রপাড়া, ভোগডোমা ও স্থানীয় জামাত মিলে প্রায় ১৫০ জন লাজনা নাসেরাত সহ শ্রোতা উপস্থিত হন।

মহানবীর জীবনের উপর আলোচনা

"গতকাল শুক্রবার বিকেল তিনটায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত সীরাতুন্‌নবী (সাঃ) জলসা স্থানীয় ৪নং বকশীবাজার রোডে দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়। মহানবীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রাহ্মচারী একাত্ম চৈতন্য, কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারের ধর্মরাজিক শ্রীমত কান্তিপাল ভিক্ষু, ঢাকা নটরডেম কলেজের উপাধ্যক্ষ ফাদার বেনজামিন কস্তা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক শাহেদ আলী, ঋতুপত্রের সম্পাদক আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ও স্বাগত ভাষণ দান করেন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সভাপতি মোহাম্মদ আবদুল হাদী প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে মোহাম্মদ আবদুল হাদী বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র বিশ্বের আশীষরূপে সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পৃথিবীতে আগমন করেন।

সভাপতির ভাষণে আলহাজ্ব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন মানব মুক্তি ও বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত। মহানবীর আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই পৃথিবীতে অশান্তি ঘনিয়ে এসেছে। মহানবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠাই বিশ্ব শান্তির পূর্বশর্ত"। (দৈনিক বাংলার বাণীর ১৯-৯-৯২ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

সম্পাদকীয়

অতিভক্তি ও অতিরঞ্জন

মহান আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে এত ভালবাসেন যে যখনই সে পাপ পঙ্কিলতার চোরা-বালিতে আটকে যায় বা চরম অবক্ষয়ের প্রবল স্রোতে খড়কুটার ন্যায় ভেসে যেতে থাকে তখন তাকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে তিনি যুগে যুগে তাঁর মানুষকে প্রেরণ করেন। এঁরাই নবী-রসূল-অবতার বা পয়গম্বর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ সর্বদা তাদেরকে 'ব্যর্থ নমস্কারে' ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তার আপনজনকে সে চিনতে পারে না। মনে করে তার চেয়ে বড় শত্রু আর বুঝি তার নেই। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর জীবন এর ব্যতিক্রম নয়।

আজকের দুনিয়াতে যে মানুষটি সব চাইতে সম্মানীত, যাঁকে খোদার পুত্র এমন কি খোদার আসনে পর্যন্ত বসাতে কুণ্ঠিত হয় নি যারা, তারা প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর সাথে কি আচরণ করেছেন তা সবারই জানা। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, গায়ে থুথু নিক্ষেপ, ইত্যাদির কথা না হয় বাদই দিলাম কিন্তু যে ক্রুশ কাষ্ঠে তাঁকে ঝুলানো হয়েছিল সে ক্রুশ কাষ্ঠটি পর্যন্ত তাঁর দ্বারা বহন না করিয়ে তারা ছাড়েনি। এহেন নিদারুন অবস্থায় হয়েছিল সেই মহাপুরুষ ঈসা নবীর (আঃ) যাত্রারম্ভ। আর আজ তিনি খোদার আসনে! এসবই হয় অতিভক্তির কারণে। অতিরঞ্জনের কারণে। অতিভক্তির কারণে আসল ঘটনার ওপর রং চড়াতে চড়াতে আসল যায় তল পড়ে রংটাই তখন কেবল মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোন নবী রসূলই এথেকে ছাড় পাননি। আমাদের প্রিয় নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন চরিত ও জীবনাদর্শও অতিভক্তি ও অতিরঞ্জনের অভিব্যক্তিতে 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হওয়ার মতই হয়েছে। সেদিন মাওলানা খন্দকার মোঃ বশীরউদ্দীন প্রণীত ও বিউটি বুক হাউস, বাংলাবাজার পরিবেশিত 'সাহাবা জীবনী' নামক একখানা পুস্তক পড়তে গিয়ে এর ১৯৯ পৃষ্ঠার নিম্নোক্ত বর্ণনার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো :

"একবার হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় দেহে সিঙ্গা লাগাইয়াছিলেন, তাতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নির্গত হয়। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে ঐ রক্ত প্রদান করিয়া উহা মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিতে আদেশ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের সেই রক্ত মাটিতে না পুঁতিয়া উহা নিজেই পান করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলেন—উহা পুঁতিয়া ফেলিয়াছি।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় পুঁতিয়াছে? তাহাতে তিনি একটু অপ্রস্তুত হইয়া শেষে স্বীকার করেন যে, উহা আমি নিজেই পান করিয়াছি।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রশ্রাব, পায়খানা ও রক্ত-পুঁজ প্রভৃতি সবই পবিত্র ছিল)।

হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহকে বলিলেন—যাহার শরীরে আমার রক্ত প্রবেশ করিবে, দোযখের অগ্নি তাহাকে স্পর্শ করিবে না, কিন্তু তোমার জন্য অনেক মানুষ মরিবে এবং তুমিও মানুষের জন্য মরিবে।"

(অবশিষ্টাংশ ৬৬ পৃঃ দেখুন)

30th September, 1992

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211 Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury